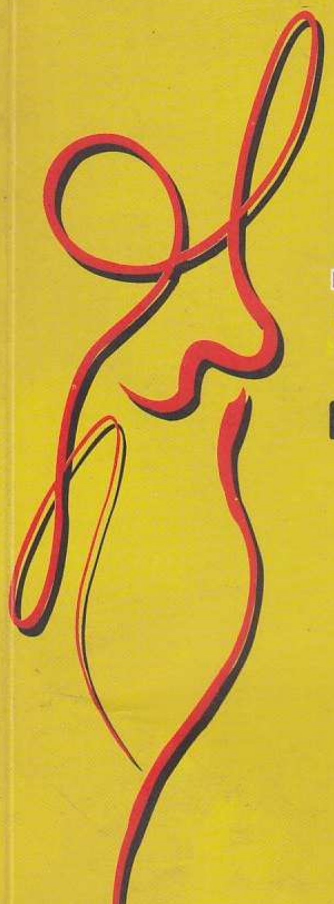

নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা-৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০১৪

THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা-৯

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

৮ মার্চ, ২০১৪

Narir katha 9
Collected writings on the occasion of International Woman's Day
Published by:
The Hunger Project
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 8802-913-0479
Website: www.thp.org and www.thpbd.org

সূচিপত্র

সুমা কর: আগৈলঝাড়ার এক সফল উদ্যোক্তা	সোহানুর রহমান
আয়েশা আক্তার: সফল এক নারী উদ্যোক্তা	নিয়াজ মোর্শেদ
মাদারীপুরের এমি আপা: আধারে আলোকবর্তিকা	মেহের আফরোজ মিতা
নুর আক্তার: আত্মনির্ভরশীল এক সমাজকর্মী	স্বপন সিকদার
দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন মঞ্জুরা আপার	শাখাওয়াত হোসেন
অশিক্ষা দমাতে পারেনি শফিকা খানমকে	ইকবাল বাহার
অদম্য মিনু এখন সরকারি চাকুরিজীবী	শাখাওয়াত হোসেন
জীবন যুদ্ধে জয়ী শারীরিক প্রতিবন্ধী মনোয়ারা	ইকবাল বাহার
মর্জিনা বেগম: জীবন সংগ্রামে লড়াকু এক সৈনিক	এ.জি.এম. আলমগীর
সমাজ বদলানোর কর্মী খন্দকার উম্মে সালমা	জিল্লুর রহমান
নার্গিস পারভীন: জীবন সংগ্রামে সফল এক নারী	আমিরুল ইসলাম অল্ডাম
সমাজ গড়ার কারিগর বিঞ্চুপুরের লাইলী পারভীন	গিয়াস উদ্দিন
মঞ্জু রাণী সোম: বলিষ্ঠ এক নারীনেত্রীর নাম	মনিরুজ্জামান মোল্লা
সফলতার ছোঁয়ায় উদ্ভাবিত লিপি আক্তার	আনিসুর রহমান
অবহেলিত নারীদের সহায় মাহমুদা আক্তার	এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন
রেহেনা আক্তার মনি: সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে যা পথচালা	খায়রুল বাশার
রেখা আক্তার: ন্যায়ের পক্ষে যার অবস্থান	শিপ্রা পাল
সমাজ উন্নয়নকর্মী শাহনাজ স্বপ্নার গল্প	এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন
কর্মে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ডাঃ রাবেয়া বেগম	মোঃ আসির উদ্দীন
নিলুফা জহুর লিলি: এক আত্মপ্রত্যয়ী জনপ্রতিনিধি	সুব্রত কুমার পাল
ফাজিলপুরের শিরিন: অদম্য এক সমাজকর্মীর নাম	মোঃ খোরশেদ আলম ও জাকারুল ইসলাম
মিনা খাতুন: চরাঞ্চলের সফল এক নারীনেত্রী	চন্দ্র শেখর
শিক্ষার আলো ছড়াতে চান সফুরা রেজা চৌধুরী	শামীমা রহমান
আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন শিল্পী রাণী রায়	নেসার আমিন
জীবনযুদ্ধে জয়ী শ্রীমঙ্গলের নারীনেত্রী সুইটি	এ.এস.এম.আখতারুল ইসলাম
স্বনির্ভর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন মর্জিনা	মোঃ আব্দুল হালিম

সম্পাদকীয়

‘এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় এখন আয়েশা আক্তারের হৃদয়ে। সেই প্রত্যয় এবার নিজেকে নিয়ে নয়, পুরো সমাজকে নিয়ে।’
‘বইল্যা পাড়াসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের দারিদ্র্যমুক্ত করে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটনোই মঞ্জুরা আক্তারের স্বপ্ন।’
‘অব্যাহত কাজের মধ্য দিয়ে খন্দকার উম্মে সালমা তার এলাকার চিরচেনা চেহারাকে বদলাতে বহুলাংশেই সফল হয়েছেন।’
‘এডুকেশন ফর ফ্রিডম (মুক্তির জন্যই শিক্ষা) – এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান সফুরা রেজা চৌধুরী। তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে।’

উপরের এ কথাগুলো কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে নেওয়া নয়। বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হওয়া কিছু নারীর সফলতার গল্পের উপসংহার থেকে নেওয়া। এই কথাগুলোই প্রমাণ করে বাংলাদেশের নারীরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, একই সাথে হতে পারে উন্নয়নের অংশীদার। আর নারীদের এ অগ্রগমনে অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

একদল সচেতন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট উজ্জীবক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিতকরণ ও তাদের নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক দল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে ‘বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক’। যার মূল লক্ষ্য নারীরা যেন নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মূল রূপকার হয়ে উঠতে পারে। নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে এক ঝাঁক বিকশিত নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে। যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিকশিত এই নারীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে বেশকিছু উদ্যোগ। তারা স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে সহায়তা করছে। দান-অনুদান আর পরনির্ভরতার সংস্কৃতির বাইরে তাদের এ সকল দৃষ্টান্ত আজ অনেকের মধ্যেই আশাবাদ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি চলছে সচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী উন্নয়ন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও চলমান বৈষম্য দূরীকরণে এসকল নারী নেতৃত্ব সম্পুর্ণরূপে স্বেচ্ছশ্রমের ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছে। এ গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলো তারই প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তেরই প্রামাণ্য দলিল।

‘নারীর কথা’ একটি ধারাবহিক সংকলন। ২০০৬ সালে এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের ধারাবাহিকতায় সাফল্যের সোপান বেয়ে নবম বারের মত ২৬ জন নারীর সফলতার কথা নিয়ে প্রকাশিত হলো নারীর কথা-৯।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীদের সফলতার কাহিনী খুবই নগণ্য মাত্রায় তুলে ধরা হয়। বরং সংবাদের একটি বড় অংশ জুড়েই থাকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুর্ঘটনার খবর। এসব সংবাদ নাগরিক জীবনে তৈরি করে হতাশা। তাছাড়া গণমাধ্যমগুলো শহরমুখী তথা রাজধানীকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড দ্বারাই প্রভাবিত। অথচ গ্রামীণ নারীদের সফলতার চিত্রগুলো গণমাধ্যমে সঠিকভাবে তুলে ধরা গেলে নারীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে এবং নতুন স্বপ্নের এক সমাজ গঠনে নারী-পুরুষ এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে।

আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তৃণমূল পর্যায়ে এ সকল সাফল্যগাঁথা সংগ্রহ করেছেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর 'বাংলা বানান অভিধান' (তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০) অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ গল্পগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে এ গ্রন্থের সাফল্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

সুমা করঃ আগৈলঝাড়ার এক সফল উদ্যোক্তা

সোহানুর রহমান

বাংলাদেশের দক্ষিণে ধান, নদী ও খাল সমৃদ্ধ জেলা বরিশাল। বিরূপ প্রকৃতির কারণে মাঝে মধ্যেই নেমে আসে সিডর কিংবা আইলার মত প্রাকৃতিক দূর্যোগ। এই দুর্যোগের সাথেই যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় এখানকার মানুষকে। অনেক কষ্ট আর সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে যারা খুঁজে নেন নিজেদের সফলতার পথ, কোনো প্রতিকূল শক্তিই তাদের পথচলা রুখতে পারে না। নদীর স্রোতধারার মতো তারা জীবনের সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যান সম্মুখপানে। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার এমন একজন সফল বিকশিত নারীনেত্রী সুমা কর।

প্রত্যন্ত ইউনিয়ন রত্নপুরের বারপাইকা গ্রামের একটি সাধারণ হিন্দু পরিবারে ১৯৮৫ সালের ৩০ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন সুমা কর। পিতা চিত্তরঞ্জন করাতি আর মাতা সোনেকা রানী। দু ভাই আর দু বোনের মধ্যে সুমা সবার বড়। বৃদ্ধ বাবার আয়ের ওপরই নির্ভর করতে হয় পুরো পরিবারকে। জমি জমা যা কিছু আছে তাতে বছরের খোরাক জোগাতেই কষ্ট হয়। যে কারণে ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে খুবই কষ্ট হয় বৃদ্ধ বাবার।

সাধারণ পরিবারের মেয়ে হয়েও সুমা করের ছিল ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা ও তা বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তার পরিবার লেখাপড়ার প্রতি ছিল উদাসীন। তারা মনে করতেন, স্কুলে গেলে সময় নষ্ট হয়, তারচেয়ে বরং বাড়িতে থাকলে মায়ের কাজে সুবিধা হয়। এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে চিন্তাভাবনা ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে হলে প্রয়োজন ধৈর্য্য, সদিচ্ছা আর আত্মবিশ্বাস। আর তার সবই ছিল সুমা করের মধ্যে। তাই পারিবারিক ও সামাজিক কোনো প্রতিকূলতাই সুমা করের লেখাপড়া বন্ধ করতে পারে নি। ১৯৯৭ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এরপর পরিবারকে সহায়তা করার জন্য পড়াশুনার বন্ধ রেখে – অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে আগৈলঝাড়া উপজেলায় সমাজ সেবা অধিদপ্তরে প্রকল্পভিত্তিক চাকুরিতে যোগদান করেন তিনি। এর কিছুদিন পর বাকের গঞ্জের ছেলে বিধান রায়ের সাথে সুমা করের বিয়ে হয়। ১৯৯৯ সালে তিনি প্রথম সন্তানের জননী হন। এর ঠিক তিন বছরের মাথায় তার কোলজুড়ে আসে দ্বিতীয় সন্তান।

শৈশবে জীবনের কোনো মানে বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয়েছিল আগৈলঝারার বাকালের সুমা করের জীবন সংসার। সময়ের পরিক্রমায় বুঝতে পেরেছিলেন জীবন আসলেই কত কঠিন! তবে জীবন যুদ্ধের নানা জটিলতায় একবারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকানোর সময় হয় নি সুমা করের।

২০১০ সাল। সুমা করের জীবনে আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। তার এলাকার ৮৭০তম ব্যাচের এক সফল উজ্জীবক সাইফুল ইসলামের অনুপ্রেরণা ও আমন্ত্রণে ১৪৪৬তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ২০১১ সালে অংশগ্রহণ করেন বরিশালের কারিতাসে বিকাশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত ৭২তম ব্যাচে ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ দুটিতে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তি

উপলব্ধি করেন। দীর্ঘদিনের লালায়িত 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার নিজের এলাকায় নতুন প্রেরণায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

প্রথমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন সুমা কর। তিনি আগৈলঝারা উপজেলা পরিষদের সামনের বাজারে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে পূজা হারবাল সেন্টার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিনি এ ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে তিনি ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করেন।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর সুমা কর নিয়মিত মাসিক ফলোআপ সভায় অংশ নেন। এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের সংগঠিত করে নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্যানিটেশন, শিশুর জন্মনিবন্ধন ও টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্রচারাভিযানে যুক্ত রয়েছেন তিনি। এভাবে উজ্জীবিত ও সংগঠিত হয়ে সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন, নারী নির্যাতন, যৌতুক ও শিশুবিবাহ প্রতিরোধসহ, সমাজে নারী-পুরষ সমতার পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রেখে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে একের পর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন সুমা কর।

সুমা কর জানান, 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ আমার জীবনে এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কীভাবে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও শিশুবিবাহ বন্ধ, মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, শতভাগ শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করা যায় – তার স্বচ্ছ ধারনা আমি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই পেয়েছি। সুমা করের মতে, সকল নারীরা যদি বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য হতো, তা হলে তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসতো আগামীর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও সুফিয়া কামালদের মতো নারীনেত্রী।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন সুমা কর।

সুমা কর এখন খুব ব্যস্ত। তার গ্রামসহ পুরো ইউনিয়ন এখন তার কর্মক্ষেত্র। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতা নিয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকাল ইউনিয়নে এমডিজি ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন সুমা রাণী কর। অবহেলিত নারীদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সদা নিবেদিত সুমা কর। স্থানীয় নারীরাও তার অনুপ্রেরণায় এখন উজ্জীবিত।

সুমা করের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ভবিষ্যত পরিকল্পনা না থাকলেও আজন্ম লালন করে চলেছেন মানুষের সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর এ কারণেই তার হাতে গড়া সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। তৃণমূলের আপামর জনগণের একনিষ্ঠ সেবক ও দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় নারীদের শেষ আশ্রয়স্থল বলিষ্ঠ নারীনেত্রী সুমা কর এগিয়ে চলছেন সম্ভাবনার এক নবদিগন্তে।

আয়েশা আক্তার: সফল এক নারী উদ্যোক্তা

নিয়াজ মোর্শেদ

নবক্ষইয়ের দশক, শিক্ষার হার খুবই কম। নারীরাও অনেক পিছিয়ে। সামাজিক কুসংস্কারের শিকার এ সময়ের বহু স্কুল পড়ুয়া মেয়ে। শিশুবিবাহকে অপরাধ হিসেবে মেনে নিতে চাইতো না গ্রামীণ পরিবারগুলো। মেয়েদের বেশি পড়াশুনা না করানোটাই ভাল এবং যতদ্রুত সম্ভব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই ভাল – এ বিষয়ে তারা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নারী হিসেবে জন্ম নিয়েছে, তাই পরের ঘরে তো যেতেই হবে, চুলোর কাছে বসে রান্না তো করতেই হবে। এই চিন্তাধারায় পাড়ি দিতে বাধ্য হন মাধবপাশার আয়েশা আক্তার (৩২)।

বাবার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তেই সপ্তম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায় আয়েশার। কথাবার্তা চলছিল শ্বশুরবাড়ির সাথে। মোটামুটি আয়োজনও চলছিল। কিন্তু এ কিসের আয়োজন – এসব কিছুই বুঝত না সদ্য কৈশরে পা দেওয়া মেয়েটি। শুধু নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেত মনের মধ্যে। উত্তর পাওয়ার আশা করত না। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছিলেন। তাই বাবার কথার উপরে কথা বলার দুঃসাহস দেখান নি আয়েশা। তাই তাদের ইচ্ছাতেই স্বামীর হাত ধরে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। তখন তিনি নিজেই জানতেন না স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির মানেটা কি?

আয়েশা আক্তারের শৈশব কাটে ঝালকাঠী জেলার বিনয়কাঠী ইউনিয়নের উত্তমপুর গ্রামে। বাবা সরকারি চাকুরি করতেন। বাবার চাকুরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছে আয়েশাকে। কখনও ভোলার সদর উপজেলায় আবার কখনও ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। দুই বোন এক ভাইয়ের মধ্যে আয়েশা আক্তার সবার ছোট।

এই ছোট্ট মেয়েটি সংসার জীবনে পাড়ি দিয়েও আলোর পথে চলা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন নি। স্বামীর বাড়ি বসেই লেখাপড়া চালিয়ে যান। কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এসএসসি। পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগে তার কোল আলো করে আসে এক ছেলে সন্তান। এর দু বছর পরই জন্ম হয় ছোট ছেলে। শুরু হয় নতুন আর এক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের নাম 'সংসার'।

এই যুদ্ধেও সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যান আয়েশা। দুই ছেলেকে লালন-পালনের মাঝে থেকেও বিরত থাকেন নি লেখাপড়া থেকে। বড় ছেলের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন এইচএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হন তিনি। এ সময় হঠাৎ ঝড় নেমে আসে তার জীবনে। স্বামীর সাথে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের শুরু হয় পারিবারিক ঝামেলা। এর জের ধরে স্বামী আর দু সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। তার স্বামী দু সন্তানসহ তাকে বাবার বাড়ি রেখে ঢাকায় চলে যান কাজের সন্ধানে।

বাবার বাড়িতে বসে দু ছেলেকে নিয়ে আবার নতুন যুদ্ধ শুরু হয় আয়েশা আক্তারের। এবারকার যুদ্ধেও জয়ী আয়েশা আক্তার। ২০০৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি বুঝতে পারেন– তিনি দূর্বল নন। তিনিও মানুষ, তারও সমাজে ভালভাবে বাঁচার

অধিকার রয়েছে। ইচ্ছেটার উপর ভিত্তি করে তিনিও হতে পারেন এই সমাজের আলোর দিশারী। অন্য নারীদের জন্য অনুকরণীয় একজন নারী।

প্রথমে তিনি নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুরু করেন কাপড়ের ব্যবসা। দু একটি কাপড় এনে গ্রামের গৃহবধুদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করলেন। ২০০১ সালে যুব উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি ব্লক বাটিকের কাজ শিখেছিলেন। কাপড়ের ব্যবসায় এ শিক্ষাকেও কাজে লাগান আয়েশা। ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়তে থাকে তার ব্লক-বাটিকের কাজের। তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন আরও সামনে।

আয়েশা এখন মাধবপাশা বাজারের একজন স্থায়ী কাপড়ের ব্যবসায়ী। মাধবপাশা বাজারে নারীদের দোকান বলতে আয়শা আক্তারের দোকানটিই রয়েছে। দু জন দর্জিও রয়েছেন তার দোকানে। তাদেরকেও মাসিক বেতন দিয়ে, দোকান ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক আরও খরচ মিটিয়ে প্রতি মাসে প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মত তার আয় হয়। আয়েশার স্বামীও ঢাকায় একটি কোম্পানিতে চাকুরি করেন। কিন্তু সংসার চালনায় স্বামীর ওপর নির্ভর করতে হয় না তাকে।

আয়েশার বড় ছেলে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিবে। আর ছোট ছেলেটা দশম শ্রেণিতে পড়ছে। আয়েশা আক্তার নিজ জীবনের তিনটি যুদ্ধেই জয়ী হয়েছেন। কিন্তু জয়ী হয়েই তিনি থেমে যান নি। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজগুলোও করে যাচ্ছেন। তিনি প্রায় ৮০ জন নারীকে সেলাই ও হাঁস-মুরগি লালন-পালনের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন।

গ্রামের নারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আয়েশা গঠন করেছেন গ্রাম্য আদালত কমিটি। যার মাধ্যমে মৌসুমীর (৮) শিশুবিবাহ বন্ধ করেছেন। ১৫ জন ঝরে পড়া কন্যাশিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করেছেন। ইউনিয়নের সহযোগিতায় একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছেন আয়েশা। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য নারীরাও যেন সচেতন হয় এবং পিছিয়ে না থাকে সেই লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন আয়েশা।

এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় এখনও তার হৃদয়ে। সেই প্রত্যয় এবার নিজেকে নিয়ে নয়, পুরো সমাজকে নিয়ে। তাই এবার নিজের সাথে যুদ্ধ নয়। বিশ্বায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত নারী উদ্যোক্তা আয়েশা আক্তার।

মাদারীপুরের এমি আপাঃ আঁধারে আলোকবর্তিকা

মেহের আফরোজ মিতা

মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের একটি অবহেলিত গ্রাম করদী। এই গ্রামে লাগে নি উন্নয়নের তেমন কোন ছোঁয়া। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত এ গ্রামটি। এখানকার মানুষদের লেখাপড়ার জন্য পায়ে হেটে আসতে হয় খানিকটা দূর শহরে। বেশিরভাগ মানুষই বাস করে দারিদ্র্যসীমার নীচে। এর জন্য দায়ী করা হয় অসচেতনতাকে। সচেতন হবার ইচ্ছেও এখানকার মানুষের মধ্যে জাগে না কখনো। 'জন্ম বিরতীকরণ পদ্ধতি' সম্পর্কে জেনেও না জানার মত বছরের পর বছর ছেলে সন্তানের আশায় একের পর এক কন্যাশিশুর বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে। এ সম্পর্কে তারা বলেন– মুখ দিবেন যিনি, আহারও দিবেন তিনি। সেই অসচেতন মানুষের কাছে যিনি সচেতনতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন বিকশিত নারীনেত্রী লাবনী আক্তার এমি। যিনি ইউনিয়নের সবার নিকট এমি আপা নামে পরিচিত।

১৯৯০ সালের ১ অক্টোবর। মাদারীপুর পৌরসভার আছমত আলী খান সড়কে সম্ভ্রান্ত মৃধা বাড়িতে মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা ও মিসেস পারুল বেগমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এমি। তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ তিনি। একটু বেশি উপার্জনের আশায় এমির বাবা দীর্ঘদিন অবস্থান করেন প্রবাসে।

শৈশব থেকেই এমি গল্প, কবিতা ও নাচের প্রতি বেশ দূর্বল। লেখাপড়ার প্রতিও ছিলেন অনেক বেশি মনোযোগী। শৈশবে তার লেখাপড়া শুরু হয় তাজন্নেছা কল্লোল শিশু বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন মাদারীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পড়া অবস্থায় মাদারীপুর জেলার মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। লেখালেখি করা বরাবরই ভালো লাগে এমির কাছে। আর নাচতেও খুব পছন্দ করে তিনি। এমন উচ্ছাস আর আনন্দে কাটতে থাকে এমির শিক্ষা জীবন।

২০০৭ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন এমি। এর দু বছর পর ২০০৯ সালে পাশ করেন এইচএসসি। বর্তমানে তিনি বিএ শেষ বর্ষের ছাত্রী। এইচএসসি শেষ করার আগেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় তার জীবনে, যার নাম 'সংসার জীবন'। ২০০৮ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে বিয়ে হয় এইচ এম জাকির হোসেন নামক এক যুবকের সাথে। তার স্বামী বাংলায় স্নাতকোত্তর। বর্তমানে একটি কোম্পানির ম্যানেজার পদে চাকুরি করছেন। স্বামীর দুই ভাই, দুই বোন। শ্বশুরের পরিবারের সবাই সব দিক দিয়ে খুব ভাল ছিল। শুধু আপত্তি ছিল এমির লেখাপড়ার ব্যাপারে। এমির তখন মনে হতো– মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেই বোধ হয় ভাল হত। তাহলে লেখাপড়া নিয়ে এমন কথা তাকে শুনতে হতো না। কিন্তু মনে মনে ভাবেন– সব মেয়ে যদি ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তো আর সমাজ চলবে না। এ সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে– আর কতকাল নারীরা পুরুষের অবাধ্য শাসনে বাধ্য হয়ে থাকবে – তাদের কি কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না – শুধু স্বামী, সংসার, ও সাংসারিক কাজের মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ নারীর জীবন।

বিয়ের পিঁড়িতে বসার পরও দৃঢ় মনোবলের কারণে লেখাপড়ার হাল ছাড়েন নি এমি। রাত দুটায় ঘুম থেকে উঠে ফজরের আজান দেওয়া পর্যন্ত নিজের মত করে পড়ে যেতেন, তারপর নামাজ পড়ে লেগে যেতেন সংসারের সকল কাজে। এভাবেই বিএ পাশ করেন এমি। এখন তার মনে হয়– একজন নারী হিসেবে শিক্ষাজীবনে তিনি যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন, তা তার নিজ মেধা আর নিরন্তর পরিশ্রমের বলেই সম্ভব হয়েছে। তাইতো সমাজের যে কোন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন তিনি।

২০১০ সালে ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য সালমা আক্তারের কাছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারেন এমি। এ সময় তার আমন্ত্রণে ঘটমাঝি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত ১০১তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এমি। উজ্জীবক কথাটা শুনলেই তার মনে হয়, একদল উজ্জীবিত নেতা। যারা পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করতে সদা উজ্জীবিত। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে যিনি প্রশিক্ষণ দিতেন (মেহের আফরোজ মিতা, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী) তিনিও একজন নারী হওয়ায় তার থেকেও অনেক কিছু শিখতে পারেন এমি। এমি জানান, মিতা আপা আমাদের শিখিয়েছেন, নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি। তাই নারীদের ক্ষমতায়িত করে তুলতে হবে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলাই হবে প্রথম লক্ষ্য।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এমি। শিশুবিবাহ বন্ধ, যৌতুক প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ অভিযান, গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা, গর্ভবতী মায়ের টিকাদান কর্মসূচি, ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ঘটমাঝি ইউনিয়নের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে উঠান বৈঠক ও কর্মশালার আয়োজন করেন তিনি। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষদের সচেতন করতে লাগলেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কিছুদিন পর এমি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের পর তার নামের সাথে যুক্ত হয় নারীনেত্রী উপাধি। এই উপাধিটা যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এমির কাজের 'আগ্রহ' ও কাজের গতি আরও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তার স্বামী তাকে উৎসাহ যোগায়। এ সময় তিনি স্থানীয় 'অবলম্বন মানব কল্যাণ সংস্থা'র সহযোগিতায় ঘটমাঝি ইউনিয়নের ৬, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ডের জন্য বিনামূল্যে পাকা স্যানিটারী ল্যাট্রিন বা রিং স্লাব বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৬, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ডের যাদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা নেই, তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নামের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে রিং স্লাব বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এমনকি রিং স্লাব বহন করার যাতায়াত খরচও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে পাকা পায়খানা তৈরি করার পর সেই সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাকে সাথে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলোতে পরিদর্শন করেন। তারা এমির কাজের প্রশংসা করেন। এভাবেই তিনি নিজেকে নিবেদিত রাখেন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে।

স্থানীয় কয়েক জন নারীকে সংগঠিত করে এমি গড়ে তুলেছেন 'আধারে আলো' নামের একটি সমবায় সমিতি। শুরুতে সমিতির ৩০ জন সদস্য থাকলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮০ জন। সদস্যরা সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় হিসেবে রাখে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি অসহায়, তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এসব অসহায় নারীরা নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচন করছে এবং পরবর্তীতে সমিতির টাকাও পরিশোধ করছে। ঋণ ছাড়াও গরু-ছাগল এবং সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া – যে যেভাবেই সাবলম্বী হতে চেয়েছে তাকে সমিতির পক্ষ থেকে সেভাবেই সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে সমিতির পক্ষ থেকে। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে সকল শ্রেণির নারী-পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পূনরায় বিদ্যালয়গামী করতে উৎসাহ যোগানো হচ্ছে। আগে অভিভাকরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে ছেলে সন্তানদের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করতেন আর কন্যা সন্তানদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়ে দিতেন। কিন্তু নারীনেত্রী এমি ও তার সমিতির প্রচেষ্টায় এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন করদী গ্রামে প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়।

এমি জানান, যদি আমি বিকশিত নারীর প্রশিক্ষণ না নিতাম তাহলে হয়তো আমি কোন দিন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেতাম না। এ প্রশিক্ষণ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। বাস্তবিক অর্থে নিজেকে আজ একজন সফল ও স্বাবলম্বী নারী বলে মনে হচ্ছে।

এমির একমাত্র মেয়ে রুপন্তীর বয়স এখন চার বছর। তাকে নিয়ে এমির অনেক স্বপ্ন। তিনি নিজে যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করে জীবন পরিচালনা করেছেন – তার মেয়ের জীবনেও এমন হোক, তা তিনি চান না। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিতে আগামী জুনে (২০১৪ সাল) আইন কলেজে ভর্তি হবেন এমি। একজন আইনজীবী হয়ে গরীব মানুষদের আইনি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে চান অবহেলিত নারীদের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে। ‘একজন নারীর জীবনে এক একটা সফলতা যে কতটা আনন্দদায়ক, যে নারী সফল হয় নি সে কোনদিন অনুভব করতে পারবে না।’ তাই গ্রামকে ভালবেসে এবং কাজের প্রতি সম্মান রেখে তিনি এগিয়ে যেতে চান অনেক দূর। এটাই এমি আপার একমাত্র অঙ্গীকার।

নুর আক্তার: আত্মনির্ভরশীল এক সমাজকর্মী

স্বপন সিকদার

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের নাওটি গ্রামের একটি টীনের ঘর। ঘরটিতে তেমন কোনো আসবাবপত্র না থাকলেও ঘরটি এমনভাবে গোছানো – যার মধ্য দিয়ে তার জীবনের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ বৈশিষ্ট্যটি হলো সংগ্রাম। ঘরের একপাশের ছোট্ট অংশে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম আসবাবপত্র, অন্যদিকে অধিকাংশ স্থানজুড়ে চারটি কাপড় সেলাইয়ের মেশিন, কাপড় কাটার জন্য একটি বড় টেবিল এবং কাপড় রাখার জন্য একটি কাঠের আলমারি। একটি মিনি গার্মেন্টস গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্ত বায়নে জীবন-সংগ্রামের সাহসী এ সৈনিকের নাম নুর আক্তার।

আজগরা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের সুরুজ মিঞা ও হাসমতের নেছার চার ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে নুর আক্তার পঞ্চম। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭৮ সালে উত্তরদা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় নুর আক্তারের শিক্ষাজীবন। কিন্তু বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পান নি তিনি। এর কারণ শিশুবিবাহ। ১৯৮২ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। একই ইউনিয়নের নাওটি গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেনের সাথে যখন তার বিয়ে হয় তখন তার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর।

জীবনের মানে কী? তা ভালভাবে বুঝে ওঠার আগেই নুর আক্তারের ঘাড়ে এসে পড়ে সংসারের সব বোঝা। স্বামীর সংসারে এসে দেখতে পান দারিদ্র্য – একজন বেকার স্বামীর সংসারে যা হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাত ও সংসারের হাজারো কাজ নিয়ে চলতে চলতে এক বছরের মধ্যেই তার কোলজুড়ে আসে এক কন্যাসন্তান। এভাবে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে আরও দু ছেলে সন্তানের মা হন নুর আক্তার।

দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কিছু একটা কাজ করার চিন্তা করতে থাকেন নুর আক্তার। কিন্তু এত কম শিক্ষা দিয়ে কী করবেন তিনি? অনেক বছর পার হয়ে যায়, কিন্তু কিছুই করা হয় না তার। ২০০০ সালে ব্র্যাক আয়োজিত গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণের পর গ্রামে গ্রামে হেটে গর্ভবতী মায়েদের টিকা দেওয়ার কাজ করতে থাকেন নুর আক্তার।

বছরের পর বছর যায়, ততদিনেও তার স্বামী রোজগারের ভালো কোনো ব্যবস্থা হয় না। যে কারণে সংসারে অভাব সব সময় তার পিছু লেগেই থাকে। জীবন চালানোর জন্য গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যার কাজটি পেশা হিসাবে – পরবর্তিতে সেটি তার নেশায় পরিণত হয়। যেহেতু কাজটিকে তিনি সামাজিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাই উপার্জন হোক বা নাই হোক কাজটি করতে থাকেন তিনি। একাজ করার জন্য মানুষ খুশি হয়ে যে অর্থ দিত তা দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করেন তিনি। এরমধ্যেই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচও চালাতে থাকেন। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেন নি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েকে পড়াতে সক্ষম হন। এরপরই সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনদের চাপে ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই মেয়েকে বিয়ে দেন। বড় ছেলেকে এসএসসি পাশ করাতে পারলেও ছোট ছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারেন নি।

এমন হতাশা নিয়ে যখন তার দিন কাটছিলো ঠিক সেই সময় নুর আক্তারের পরিচয় হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী স্বপন সিকদারের সাথে। স্বপন সিকদারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ২০১২ সালের ১৬-১৯ মার্চ

নোয়াখালী এনআরডিএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত ৮২তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন নুর আক্তার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি উপলব্ধি করেন – তিনি শুধুই নারী না, তিনি প্রথমত একজন মানুষ এবং তার পক্ষেও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে কিছু একটা করার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হন নুর আক্তার। কিন্তু কিছু করার জন্য চাই টাকা। কিন্তু কোথা থেকে আসবে সেই টাকা। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক সময় সিদ্ধান্ত নেন ছোট কিছু করার। নারীনেত্রীদের মাসিক ফলোআপ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে যাতায়াত বাবদ যে টাকা পেতেন সেখান থেকে দিনের পর দিন কিছু টাকা জমা করেন। এ জমানো টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন তিনি। এরপর স্থানীয় নারীনেত্রী আকলিমা আক্তারের নিকট থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ ঘরেই সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। যেহেতু তিনি আগে থেকেই সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন – তাই গ্রামের নারীরা কাপড় সেলাই করার জন্য তার কাছে ছুটে আসে। এভাবে তার কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে, সেই সাথে বাড়তে থাকে আয়ও। আস্তে আস্তে তিনি আরও একটি মেশিন ক্রয় করেন ও দু জন কারিগর নিয়োজিত করেন। নুর আক্তার হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল। গত এক বছর যাবৎ তিনি প্রতিমাসে প্রায় দশ হাজার টাকা আয় করেছেন, যা দিয়ে পরিবার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করছেন।

নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত হন নুর আক্তার। তিনি ইতিমধ্যে আজগরা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ছয়টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছেন। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে ১৮টি প্রচারাভিযান ও শিশুবিবাহ বন্ধে ৩২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। এছাড়া তার ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯০ জন গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিন মাসব্যাপী ওজন পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ দেন।

সমাজ উন্নয়নমূলক এ কাজগুলো করে মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পান নুর আক্তার। তিনি মনে করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে, তাহলে একদিন সমাজ থেকে অশিক্ষা দূর হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠবে। গড়ে ওঠবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুন্দর সুখী সমাজ। সেই সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই সদা নিবেদিত আত্মনির্ভরশীল ও সফল সমাজকর্মী নুর আক্তার।

দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন মঞ্জুরা আপার

শাখাওয়াত হোসেন

প্রাচুর্যের মোহ মানুষকে বন্দি করে রাখে এক বৃত্তের মাঝে। ভাবনাগুলো হয় কেবল আত্মকেন্দ্রিক। বিত্ত বিলাসের মোহে মানুষ হারায় প্রিয় মানুষ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সব কিছু। এমনকি নৈতিকতাও হারিয়ে ফেলে মনের অজান্তে। কিন্তু প্রাচুর্য যাকে সাধারণ জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি তাদেরই একজন কক্সবাজারের মঞ্জুরা। পুরো নাম মঞ্জুরা আক্তার।

১৯৬৪ সালে চকরিয়া উপজেলার লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন এই প্রকৃতি প্রেমী ও সদা হাস্যোজ্জল মানব দরদী নারী মঞ্জুরা। বাবা জিয়াউল কবির আর মা ফজিলাতুন্নাহার। তিন বোন ও পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় মঞ্জুরা। তার বাবা জিয়াউল কবির ছিলেন কৃষি প্রিয় মানুষ। কৃষি প্রিয় পিতার মেয়ে হিসেবে মঞ্জুরার মধ্যেও কৃষি প্রীতি জন্ম নেয়। বাবার কাছ থেকে বাড়ির আঙ্গিনায় ও আশপাশের জমিতে শাক সবজি চাষের প্রশিক্ষণ পান তিনি। বাপ মেয়ে মিলে শাক সবজি চাষ করে বছরব্যাপী পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় সবজির চাহিদা মেটাতেন।

শৈশব থেকে লেখাপড়ার প্রতিও মঞ্জুরার ছিল প্রবল ঝোঁক। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে ভর্তি হন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। গভীর অধ্যাবসায়ের ফলে সাফল্যের সাথে এসএসসি পাশ করেন তিনি। কিন্তু পারিবারিক চাপের মুখে এসএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া হয় নি তার। ১৯৮২ সালে কক্সবাজার সদরের বইল্যার পাড়া গ্রামের অ্যাডভোকেট মোঃ আলীর পুত্র প্রকৌশলী ওসমান গণির সাথে বিয়ে হয়ে যায় মঞ্জুরার।

বিয়ের এক বছর পরই স্বামীর সাথে (স্বামীর কর্মস্থল) সৌদি আরব চলে যেতে হয় তাকে। কিন্তু দেশের মাটি ও মানুষের সাথে থাকার মাঝেই যদি কেউ আনন্দ খুঁজে পায়, তখন তাকে অন্য কোনো দেশ কিংবা কাজ তাকে আটকে রাখতে পারে না। দেশের জন্য সব সময় তিনি টান অনুভব করতেন। এ টানেই ১৯৮৬ সালে স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসেন মঞ্জুরা।

স্বামী, সন্তান, সংসার থাকা স্বত্ত্বেও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আবারও লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন মঞ্জুরা। সাথে সাথে ছোটবেলার সেই শখের প্রতি প্রেম নতুন করে জাগ্রত হয় তার। বসত বাড়ির পাশে খালি জায়গাগুলো তাকে প্রবলভাবে যেন চাপ দেয় কোনো কিছু করার জন্য। মাঝে মাঝে লেখাপড়ার ফাঁকে মাটির সাথে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে নেন মঞ্জুরা। ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পাশ করে বিএ-তে ভর্তি হন। কিন্তু সংসারের চাপের মুখে বিএ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

পড়াশুনার পর্ব যেহেতু শেষ, তাই এবার সন্তানদের পড়ালেখার প্রতি মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন মঞ্জুরা। অবসর সময়ে বাড়ির পাশে খালি জায়গায় শাক সবজির বাগান, আর ছোট পুকুরটিতে মাছ চাষের পরিকল্পনা নেন। যেই ভাবা সেই কাজ। মরিচ, সীম, লাউ, টমেটোসহ নানা ধরনের শাক সবজি লাগান সবজি বাগানে। বাগানে চাষ হওয়া শাক সবজি পরিবারের সবজির চাহিদা মেটায়। সাথে পুকুরের মাছতো আছেই। বসত ভিটার ছোট এক কোনায় বাঁশ বাগানও করে নেন মঞ্জুরা। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল তার জীবন।

২০০৯ সালে তিনি অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। একই বছর অংশ নেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ দুটি মঞ্জুরার অর্জিত দক্ষতাকে দ্বিগুণ করে দেয়। প্রশিক্ষণের পর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে মঞ্জুরা বলেন, ব্যক্তিগত ঘর-সংসার নিয়ে নানারকম জীবন জটিলতার কারণে একরকম হারিয়েই গিয়েছিলাম; কিন্তু উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে নতুনরূপে খুঁজে পাই। বুঝতে পারি, শুধু আত্মন্নোয়ন কিংবা ঘর-সংসার নিয়েই নারীর জীবন নয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্যও সাধ্যমত কাজ করা প্রয়োজন।

এই আত্মপোলব্ধির পর সৃজনশীল এই নারী সমাজের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। গ্রামের অসহায় নারীদের জন্য কিছু করার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে এলাকার আট জন দরিদ্র নারীকে নকশী কাঁথা সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের পর এসব নারীগণ নকশী কাঁথা সেলাই করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। মঞ্জুরা নিজেও নকশী কাঁথা সেলাই করতেন। তার সুন্দর কারুকাজে গড়া নকশী কাঁথাগুলো এলাকার প্রসিদ্ধ একটি পণ্য বললে বেশি বলা হবে না।

এছাড়া মানব দরদী এই নারীনেত্রী সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যৌতুক, শিশুবিবাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনসহ নানা বিষয় নিয়ে মানুষদের সচেতন করে তুলছেন। এ লক্ষ্যে তিনি পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক আর সমাবেশের আয়োজন করেন। সন্তানরা সবাই বড় হয়ে যাওয়ায় এখন সমাজের উন্নয়নে প্রচুর সময় ব্যয় করতে পারেন তিনি। মঞ্জুরা নিজের উদ্যোগে 'উইকেন' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তিনি এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া সুফিয়া কামাল ফেলো, রেড ক্রিসেন্টসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার লোকদের তা প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন মঞ্জুরা। বিভিন্ন সংস্থা থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র যা পান তা এলাকার মানুষের জন্য নিয়ে আসেন এবং তাদের মাঝে তা বিলি করে নিজেকে ধন্য করেন।

বইল্যা পাড়ায় এখন সবার চেনা মুখ মঞ্জুরা আপা। অসহায় নারীদের আস্থার জায়গা। নারী নির্যাতনের শিকার হওয়া অনেকেই এখন মঞ্জুরা আপার গুণে সুখের সংসার ফিরে পেয়েছেন। সুখের সংসার ফিরে পাওয়া হুমাইরা ও সাবিনা স্বামীর ঘর থেকে নিয়মিত বেড়াতে আসেন প্রিয় মঞ্জুরা আপার বাসায়।

ছোট বড় সবার প্রিয় মঞ্জুরা আপা বলেন, পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট না। সব কাজই বড়। সমাজের জন্য কিছু করার আনন্দ আমি শিখেছি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে। তিনি আরও বলেন, বইল্যা পাড়াসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের দারিদ্র্যমুক্ত করে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটনোই আমার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার ও প্রশাসনসহ সমাজের সকলের সহযোগিতা কামনা করেন মঞ্জুরা আক্তার।

অশিক্ষা দমাতে পারেনি শফিকা খানমকে

ইকবাল বাহার

গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকা দেওয়ার জন্য পাড়ার প্রতিটি ঘরে ঘরে যার পা পড়ে, যক্ষ্মা রোগের কফ পরীক্ষার জন্য যার কাছে সবাই ছুটে আসে পাড়ার সকল নারী-পুরুষ – সে-ই শফিকা খানম।

১৯৯১ সালের ৫ মে। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের পুরুইত্যাখালী গ্রামের নিঃস্ব এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শফিকা খানম। পিতার নাম কেরামত আলী, মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম – তাই ধুলা আর কাদা মাটিতেই কাটে তার জীবন। অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ের ধারে কাছেও যেতে পারেন নি কখনো। দরিদ্র অশিক্ষিত মা বাবাও শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন চরম উদাসীন। আর দশটি মেয়ের মতো কিশোর বয়সে বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিবারে সময় দিতেই সময় শেষ। তাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় কোথায়?

মাত্র সাত বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে যান শফিকা খানমের বাবা কেরামত আলী। বাবার মৃত্যুর পর তার জীবনের সব আশাই যেন শেষ হয়ে যায়। অসহায় মা মনোয়ারা খেয়ে না খেয়ে মেয়েকে কোনরকমে আগলে রাখেন। গায়ের রং ফর্সা না হলেও চেহারা আর শরীরটা দেখতে তত বেশি অসুন্দর ছিল না। তাই তার ওপর নজর পড়ে একই উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের খিলছাদক পাড়ার আব্দুল কাদেরের পুত্র জসিম উদ্দিনের। প্রথম বিয়ের কথা গোপন রেখেই ১৪ বছরের কিশোরী শফিকাকে ২০০৫ সালে বিয়ে করে জসিম উদ্দিন। আরেকদিকে মেয়েকে সুখে রাখার মানসে দরিদ্র মা মনোয়ারা জসিম উদ্দিনের সম্পর্কে খুব বেশি খোঁজ-খবর না নিয়ে এতিম অসহায় শফিকাকে তার হাতে তুলে দেন। বিয়ে শব্দটি বুঝে ওঠার আগেই শিশুবিবাহের শিকার হয়ে শফিকাকে মনের অজান্তেই চোখের জলে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়। কৈশোরে জীবনের সংজ্ঞা না বুঝে ওঠার আগেই শফিকাকে শুরু করতে হয় জীবন সংগ্রাম।

শফিকা ভাবেন, এইবার বুঝি তার দুঃখের দিন অবসান হবে। মুখে জুটবে দু মুঠো ভাত। বিয়ের পর কয়েক মাস স্বামীর ঘরে সুখেই দিন কাটে তার। কিন্তু সবার কপালে নাকি সুখ স্থায়ী হয় না। শফিকার ক্ষেত্রেও ঘটলো তাই। বিয়ের এক বছর পর হঠাৎ একদিন জানতে পারেন যে, তার স্বামীর আরও একটি স্ত্রী আছে – প্রথম বিয়ের তথ্য গোপন করেই তাকে বিয়ে করেছে। শফিকার মাথায় যেন আসমান ভেঙে পড়ে। কি করবেন? ততদিনে তার কোলজুড়ে আসে অবুঝ এক পুত্র সন্তান। অনেক ভেবে চিন্তে একটু সুখে থাকার আশায় সতীনের সাথেই ঘর সংসার করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পাষণ্ড স্বামী তাকে কারণে অকারণে নির্যাতন করতে থাকে। স্বামীকে বুঝিয়েও কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে বিয়ের দেড় বছরের মাথায় ২০০৭ সালে সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে আসেন।

শফিকার বাবার কোনো বাড়ি বা জায়গা-জমি ছিল না। চাচাদের ভিটায় মায়ের খড়ের কুটির ঘরে থেকে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমদিকে পাষণ্ড স্বামী তার কোনো খোঁজ খবর না নিলেও এক বছর পর গ্রাম্য সালিশে শফিকাকে মেনে নেয় তার স্বামী। সুখের আশায় শফিকা আবার চলে যান স্বামীর ঘরে। এক বছর খেয়ে না খেয়ে স্বামী সংসারে কোনো প্রকার দিন কাটলেও শেষ পর্যন্ত শফিকা স্বামী আর সতিনের নির্যাতন সইতে না পেরে আবারও মায়ের কাছে চলে আসেন। দুঃখে কষ্টে তার জীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জীবনের প্রতি তৈরি হয় বিতৃষ্ণা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ২০১০ সালে শফিকা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান এবং অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রভৃতি পর্বগুলো তার ভীষণ ভালো লাগে। শফিকা বলেন, প্রশিক্ষণের পূর্বে যে কোনো কাজ শুরুর পূর্বে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে মনে হত, আমাকে দিয়ে বুঝি এই কাজ হবে না। সব সময় একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতাম। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর এই দ্বিধা কেটে যায়, মনে হতে থাকে – নারী নয়, আমিও একজন মানুষ। সুতরাং যে কোনো কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব। প্রশিক্ষণের এই আত্মবিশ্বাসই শফিকাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার শপথ নেন শফিকা। লেখাপড়া জানা না থাকায় ভালো কোনো চাকুরি তিনি করতে পারবেন না – তাই নতুন করে লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করেন। অবশেষে পাড়ার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের কাছে পড়ালেখা শিখে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হন। চেষ্টা করতে থাকেন কিছু একটা করার। শেষ পর্যন্ত ব্র্যাকের যক্ষ্মা প্রতিরোধ প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ পান শফিকা। চাকুরি থেকে উপার্জন হওয়া সামান্য আয় দিয়েই তার সংসার চলতে থাকে। এর পাশাপাশি বাড়ির আশপাশের সামান্য কিছু জমিতে শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। এখান থেকে প্রতিমাসে আয় হয় দেড় হাজার টাকা। এ সময় তিনি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে 'নারী উন্নয়ন সমিতি' নামক একটি সমিতি গড়ে তুলেন। সমিতির ২৫ জন সদস্য প্রতি সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় করে। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয় হাজার টাকা। এসব কাজের মাধ্যমে শফিকা এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী।

এ সময় শফিকা সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। নিজের পাড়ার দরিদ্র মানুষগুলোকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তার কর্মকাণ্ড দেখে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাকে কাজে লাগানোর জন্য এগিয়ে আসে। ২০১২ সালে নভেম্বরে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এ প্রশিক্ষণ তার আত্মশক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শফিকা বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর অধিকার, চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো জানতে পেরেছি। এছাড়া নারীর অধিকার আদায়ের জন্য নারীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে – এ বিষয়টিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশিক্ষণের পর শফিকা সমাজের মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, যক্ষ্মা নিরূপণ, শিশুবিবাহ বন্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাড়ির আঙ্গিনায় ও বাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে সবজি চাষ করার বিষয়েও স্থানীয় জনগণকে উৎসাহ যোগান তিনি।

শফিকা জানান, পুরুইত্যাখালীকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বর্তমানে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করছেন এবং তা অব্যাহত থাকলে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

৭নং ওয়ার্ড সদস্য শামশুল আলম বলেন, শিক্ষার অভাবে শফিকা হয়তো বেশিকিছু জানেন না, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে তার রয়েছে অদম্য ইচ্ছা। তাই তার ইচ্ছা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সহযোগিতা করে যাব।

শফিকা জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তার ভাগ্য বদলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। শৈশবে বাবার মৃত্যুর পর থেকে যে শফিকাকে খেয়ে না খেয়ে কাটাতে হয়েছে, শুধুমাত্র অদম্য ইচ্ছা আর আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে তিনি এখন অনেকটাই স্বচ্ছল জীবন-যাপন করছেন – পাশাপাশি অবদান রাখছেন সমাজ উন্নয়নে।

অদম্য মিনু এখন সরকারি চাকুরিজীবী

শাখাওয়াত হোসেন

সমাজে যৌতুক বিরোধী সভা পরিচালনা, শিশুবিবাহ বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলাসহ সমাজ উন্নয়নের নানা কাজে সদা নিবেদিত এক নারীর নাম মিনু। পুরো নাম শায়রা খাতুন মিনু।

১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিল কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া জমিদারপাড়া গ্রামের নিম্নবিত্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মিনু। বাবার নাম আবক্ষাছ উদ্দীন সিকদার আর মা জুবেদান্নাহার। শৈশবে মিনু ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির। লেখাপড়ার প্রতি তার ছিল প্রবল ঝোঁক। গভীর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষিত হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু বাঁধ সাধে শিশুবিবাহ। অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর পারিবারিক সিদ্ধান্তে শিশুবিবাহের শিকার হন তিনি। ১৯৯৮ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সাতকানিয়া হাসিলাইশ এলাকার আশরাফুল ইসলামের ঘরে বৌ হয়ে যেতে হয় নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। জীবনের সংজ্ঞা বুঝে ওঠার আগেই তাকে শুরু করতে হয় জীবন সংসার।

বিয়ের পর এক বছর পর্যন্ত শ্বশুর বাড়িতে সুখে থাকলেও কোনো কারণ ছাড়াই ১৯৯৯ সালে মিনুকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মনের মধ্যে প্রচণ্ড জাগে মিনুর মধ্যে। স্বামীর বাড়িতে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তার কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক কন্যাশিশু।

বাপের বাড়ি চলে আসার পর দীর্ঘদিন মিনুর কোনো খোঁজ-খবর নেয়নি তার স্বামী। তিন বছর পর স্বামী আশরাফ আবার তার কাছে ফিরে আসে এবং ক্ষমা চায়। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন মিনু। স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে কক্সবাজার শহরের এক ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন মিনু। একটুকু সুখের আশায় কোন কিছু না বলে মিনু স্বামী আগের সবকিছু মেনে নেয়। কিন্তু সুখ তার যে কপালে নেই তা তো তার জানা ছিল না। কথায় বলে, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, আশরাফের বেলায়ও তাই হয়। আবার চলে যায় মিনুকে ফেলে। ততদিনে মিনুর পেটে রেখে যায় আর এক সন্তান।

সবার কপালে নাকি সুখ স্থায়ী হয় না। স্বামী চলে যাওয়ার পর মিনুর ক্ষেত্রেও এই প্রবাদটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু অদম্য মিনু থেমে থাকেননি। ২০০৪ সালে দৃঢ় অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যাল থেকে এসএসসি পাস করেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ সনদ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাতে থাকেন এবং সন্তানদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

২০০৯ সালে মিনু অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণে জেন্ডার, নারী-পুরুষের সমতা, নারীদের অবস্থা এবং অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলো তার মনে দাগ কাটে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রথমে নিজেকে স্বাবলম্বী করে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করার সংকল্প নেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, কেবলমাত্র নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন

এবং এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি চেতনা সৃষ্টি করতে পারলেই তার মত সমাজের অন্য সব পিছিয়ে পড়া নারীদের সমানের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে দারুনভাবে ঘুরে দাঁড়ান মিনু। এবার সামাজিক কাজেও আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। জমিদার পাড়ার প্রতিটি দ্বারে-দ্বারে মিনু মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেন। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বক্তব্য সমাজের অবহেলিত মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। এছাড়া সমাজের দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখান।

একই এলাকার আর এক উজ্জীবক আমিনুল মোস্তফা তার প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১১ সালে মিনুকে সহকারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এখন এই বিদ্যালয়টি সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় ধাপে সরকারিকরণের তালিকায় আছে। সেই হিসেবে মিনু এখন সরকারি চাকুরিজীবী। জমিদার পাড়ার এই সাহসী নারী সায়রা খাতুন মিনু জানান, উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এক প্রেরণার নাম। তার স্বপ্ন জমিদার পাড়ার সবাইকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে সাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং এ পাড়াকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করা। একইসাথে যৌতুক, শিশুবিবাহ ও নারী নির্যাতনমুক্ত এক সমাজও গড়ে তুলতে চান মিনু।

জীবন যুদ্ধে জয়ী শারীরিক প্রতিবন্ধী মনোয়ারা

ইকবাল বাহার

ছবি: উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন মনোয়ারা বেগম (মাঝখানে দাঁড়ানো)।

দারিদ্র্য, ভয়-ভীতি, লোকলজ্জা ও প্রতিবন্ধকতাসহ সকল প্রতিকূলতা জয় করে উদ্ভাসিত আলোর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন হার না মানা শারীরিক প্রতিবন্ধী মনোয়ারা বেগম। প্রতিবন্ধীত্ব জীবনকে থামাতে পারে না – ইচ্ছা থাকলে কোনো বাধাই জীবন চলার পথে দাঁড়াতে পারে না কাঁটা হয়ে এবং নিজেকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় – মনোয়ারা বেগম যেন তারই প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন। বলছি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া বাজার পাড়ার মনোয়ারা বেগমের কথা।

মনোয়ারার জন্ম ১৯৮২ সালে। বাবা মোহাম্মদ দলিল, আর মা ছফুরা বেগম। জন্মের পর থেকে হাসি, খুশি আর প্রাণবন্ত শিশুটি যে শারীরিক প্রতিবন্ধী তা কেউ বুঝতে পারে নি। যতই দিন যায় ততই তার পরিবার বুঝতে পারে মনোয়ারা শারীরিক প্রতিবন্ধী।

পরিবারে অভাব অনটন। তাই বলে কি থেমে থাকবে মনোয়ারার শিক্ষাজীবন? না। দরিদ্র পিতা শারীরিক প্রতিবন্ধী জেনেও মনোয়ারাকে সাহস করে বিদ্যালয়ে পাঠান। যদিও শারীরিক প্রতিবন্ধী – কিন্তু প্রবল মেধাবী মনোয়ারার মেধার ঝলক দেখে বিস্মিত হন স্বয়ং তার শিক্ষকেরা। ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান তার জন্য অবধারিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও তার ধারাবহিকতা বজায় থাকে। ২০০৮ সালে জিপিএ ৪.০৫ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন। অসুস্থতার কারণে গণিত পরীক্ষা খারাপ করায় আশানুরূপ হয় নি। এসএসসি পাশের পর থেমে যায় মনোয়ারার লেখাপড়া। দরিদ্র পিতার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র অর্থের অভাবে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তিনি।

লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন মনোয়ারা। নিজেকে চরম অসহায় মনে হয়। মনে মনে ভাবেন – বিধাতা তাকে কেন দরিদ্র পিতার ঘরে জন্ম দিলেন। প্রতিবন্ধীদের সবাই কেন যেন অন্যচোখে দেখে। তাহলে জন্মই কি তার আজন্ম পাপ।

ঠিক তখনই ২০০৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। চার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ তাকে ফিরিয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস। এই প্রশিক্ষণই তাকে শেখায় জীবন চলার নতুন পথ। ভালবাসতে শেখায় নিজের জীবনকে, সমাজের মানুষকে, সর্বোপরি দেশকে।

প্রশিক্ষণের পর মনোয়ারা নিজের জীবনের স্বপ্নপূরণ আর স্থানীয় নারীদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা আঁকতে থাকেন। সমবয়সী সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেও শারীরিক প্রতিবন্ধী মনোয়ারাকে বিয়ে করবে কে? এই নিয়ে মনোয়ারার মধ্যে কোনো আপসোস নেই। সমাজের অন্য দশ জন মানুষের মতন সমাজ পরিবর্তনের শপথ নেন তিনি।

নারী নির্যাতন ও যৌতুক ও শিশুবিবাহ বন্ধসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির মত সামাজিক কাজে নিজেকে মেলে ধরেন মনোয়ারা। এ লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন উঠান বৈঠক পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

২০১২ সালে মনোয়ারা অংশগ্রহণ করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে। এ প্রশিক্ষণটি তার চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে এবং সমাজের অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে আর বেশি পরিমাণে কাজ করার দৃঢ় সংকল্প নেন। সমাজ উন্নয়নে তার কর্মকাণ্ড দেখে পাড়ার সকল নারী তাকে নেত্রী বলে ডাকে। যে কোনো নারী সমস্যায় পড়লে তার কাছে ছুটে আসে পরামর্শ নিতে। মনোয়ারাও সাধ্যমত তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করেন।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতে পেরে দারুণ খুশি মনোয়ারা। তিনি বলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এ ফাউন্ডেশন কোর্স আমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমাকে শিখিয়েছে প্রতিটি মানুষেরই সমাজের প্রতি রয়েছে কিছু দায়বদ্ধতা। তাই সামাজিক কাজ করে আমি যদি অন্য কারও মধ্যে সুখ দেখি – তখন খুব খুশি হই। অসহায় মানুষদের সুখকেই আমারই সুখ বলে মনে করি।

মনোয়ারা জানান, প্রতিবন্ধী হলেও আমরাও যে সাধারণ মানুষের মতই সমাজ সংস্কারে সকল কাজ করে যেতে পারি – তা দেখিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এলাকায় শতভাগ স্যানিটেশন বাস্তবায়ন করতে সকলের সহযোগিতা চাই এবং এলাকাকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

সদিচ্ছা থাকলে দারিদ্র্য আর শারীরিক প্রতিবন্ধীত্ব কোনো কিছুই মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারে না, মনোয়ারা যেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মর্জিনা বেগম: নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক অগ্রগামী সৈনিক

এ.জি.এম. আলমগীর

ছোটবেলা থেকেই বড় প্রতিবাদী স্বভাবের ছিলেন তিনি। পরিবারের মধ্যে কোনো জিনিস কাউকে কম আবার কাউকে বেশি দিলে তিনি খুবই মনক্ষুণ্ন হতেন। একইভাবে চোখের সামনে অন্য কোনো অন্যায় হতে দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করতেন। এই প্রতিবাদের কারণেই তিনি চার দেয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার করতে থাকেন মানুষকে। সমাজের দুর্বৃত্তদের রক্তচক্ষুকে তিনি একটুও ভয় পান না। বীরদর্পে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে চান তিনি। বলছি মুন্সীগঞ্জ সদরের রামপাল ইউনিয়নের খানকা দালালপাড়া গ্রামের মর্জিনা বেগমের কথা।

মর্জিনা বেগমের জন্ম ৩ জানুয়ারি, ১৯৭০ সালে। বাবা মজিবুর রহমান মন্ডল আর মা হাজেরা বেগমের এক মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে মর্জিনা বেগম সবার বড়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মর্জিনা ভর্তি হন রামপাল উচ্চ বিদ্যালয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্তে পূর্ব দেওসারের হাসেম দেওয়ানের সাথে বিয়ে হয় তার। বিয়ের পর সংসারের দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে আর লেখাপড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। স্বামীর সংসারকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য গৃহ কাজের পাশাপাশি তিনি ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করতেন এবং থান কাপড় বিক্রি এবং একই সাথে তিনি মোবাইল ফোনের ব্যবসাও শুরু করেন।

বিয়ের পরও কোথাও কোনো অন্যায় হতে দেখলে বা কোনো অসহায় নারীকে বিপদে পড়তে দেখলে তার সাহায্যে এগিয়ে যেতেন মর্জিনা। এমনি একটি ঘটনার বর্ণনা দেন মর্জিনা বেগম। তিনি জানান, ‘পার্শ্ববর্তী চুড়াইল গ্রামের মেয়ে মিতা বেগমের সাথে স্বামীর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। স্বামী কপিল উদ্দিন সন্তানকে সাথে নিয়ে বউকে শ্বশুরবাড়ি রেখেই নিজ বাড়ি চলে যান এবং মিতা বেগমকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় আমি সেদিন রাত দশটায় মিতা বেগমকে নিয়ে তার স্বামীর বাড়ি যাই। মিতা বেগমের শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে দেখা করে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনি এবং ভোর চারটায় নিজ বাসায় ফিরে আসি।’ এতে মিতা বেগম তালাকের হাত থেকে রক্ষা পান।

আশপাশের নারীদের নির্যাতনের চিত্র মর্জিনা বেগমকে দারুণভাবে পীড়া দিতে থাকে। যার কারণে মর্জিনা দিন দিন আরও তীব্র প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং যার ফলস্বরূপ গ্রামের সালিশগুলোতে তার ডাক পড়তে শুরু করে। এরপর তার কাজকে আরও এড়িয়ে নেওয়ার জন্য মর্জিনা বেগম ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে শুরু করেন। তার মা হাজেরা খাতুন এ কাজে তাকে উৎসাহ যোগান।

অতঃপর ২০০৩ সালে রামপাল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন মর্জিনা বেগম। ৪৮০০ ভোট পেয়ে জয়লাভও করেন তিনি। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার পর থেকে অন্যায় অবিচার আর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করতে শুরু করেন তিনি।

২০০৩ সালে পূর্ব দেওসারের সিরাজুল ইসলামের মেয়ে রুশিয়া বেগমের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। মর্জিনা বেগম ছেলের মা-বাবা ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বুঝিয়ে রুশিয়া বেগমকে যৌতুকবিহীনভাবেই বিয়ে দেন।

২০০৫ সালে রিকাবি বাজার সোনালী কমিউনিটি সেন্টারে মাসুদ ফকরী খোকন ও নাসিমা ইয়াসমিনের আমন্ত্রণে মর্জিনা বেগম অংশগ্রহণ করেন চার দিনব্যাপী দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার পর থেকে মর্জিনা বেগম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তার সামাজিক কার্যক্রমগুলোকে আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে শুরু করেন।

২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে মর্জিনা বেগম স্থানীয় নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে রামপাল, কালিঞ্জীপাড়া, পালের ভরট, পুর্ব দেওসার, দক্ষিণ দেওসার, পশ্চিম দেওসার, ধলাগাঁও, গবিন্দপুর, খানকা দালাল পাড়া, চৌগাড়ার পার গামের ৬০ জন মহিলাকে নিয়ে দক্ষিণ দেওসার মহিলা সমিতি গঠন করেন। সমিতির সদস্যদের মাসে ১০ টাকা চাদা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি মাসে এক বার তারা মাসিক সভায় মিলিত হন। ২০০৬ সালে এ সমিতির উদ্যোগে ৪০ জন নারীকে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং পাঁচ জন নারীকে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ থেকে দক্ষ দাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দক্ষ দাইদের সেবার মাধ্যমে প্রায় এ পর্যন্ত ৫০ জন মাতা নিরাপদে সন্তান প্রসব করেছেন। প্রশিক্ষণ নেওয়া পূর্ব দেওসারের হাঁসি বেগম (স্বামী রিপন দেওয়ান) এবং একই গ্রামের রেহানা বেগম (স্বামী নুর ইসলাম) সেলাইয়ের কাজ করে বর্তমানে স্বাবলম্বী হয়েছেন। দালালপাড়ার নাজমা বেগম নকশি কাঁথা সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

মর্জিনা বেগম ২০০৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের ১০টি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ৬০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার উপকরণ বিতরণ করেন। যার মাধ্যমে ১০০টি পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার সুযোগ পায়। নয়টি পরিবারের মধ্যে নলকূপ বিতরণের মাধ্যমে প্রায় ২০টি পরিবারে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পান করার ব্যবস্থা করেন। একইভাবে তার প্রচেষ্টায় তিনটি ওয়ার্ডের ৬০ জনকে বয়স্ক ভাতা এবং ৩০ জনকে বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া মর্জিনা বেগম তিনটি ওয়ার্ডে ১৮ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে দেন।

মর্জিনা বেগমের এসব কার্যক্রম সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা এবং ধারাহিকভাবে সমস্যাসমূহ সমাধান করার ফলে ২০১১ সালে ৪৯০০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করেন।

২০১৩ সালে দেওসারের বারেক দালালের ১৪ বছরের মেয়ের সাথে একই গ্রামের ২৫ বছরের ছেলের সাথে বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মর্জিনা বেগম মেয়ের বাবাকে শিশুবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত করেন এবং মেয়েকে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখার অনুরোধ করেন। তাতে মেয়ের বাবা সম্মত না হলে মর্জিনা বেগম মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শারাবান তাহুরার সাথে আলোচনা করে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় এ শিশুবিবাহ প্রতিরোধ করেন।

জোড়ারদেউলের মাসুদা বেগমকে তার স্বামী জালাল উদ্দিন ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতন করতেন। দিন দিন তার ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। এমনকি সন্তান দুটোকে নিজের সন্তান বলে মেনে নিতেও অস্বীকার কওে তার স্বামী জালাল উদ্দিন। অনেক বিচার সালিশ করেও তার কোনো ফল হয়নি। উপরন্তু মাসুদা বেগমের সাথে তার স্বামীর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময় মর্জিনা বেগম ব্র্যাকের আইনি সহায়তা নিয়ে কোর্টে মাসুদা বেগমের স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার রায়ে আসামীর তিন মাসের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে মাসুদার স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের মেনে নেন। বর্তমানে তারা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

দেওসারের মেয়ে জুলেখা বেগমকে মহাখালী হাওলাদার বাড়ির মোশারফ হোসেনের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকে স্বামী মোশারফ স্ত্রী জুলেখার ওপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন চালাতেন। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিচারের মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করেও বার বার ব্যর্থ হন। ঠিক সে সময় মর্জিনা বেগম মুন্সীগঞ্জ জর্জ কোর্টে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেন। ২০০৬ সালে জর্জ কোর্টের মামলার রায়ে কনের কাবিনের দুই লক্ষ টাকা এবং খোরপোষ বাবদ এক লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর মর্জিনা বেগম রামপাল, কালিঞ্জীপাড়া, পালের ভরট, পুর্ব দেওসার , দক্ষিণ দেওসার, পশ্চিম দেওসার, ধলাগাঁও, গবিন্দপুর, খানকা দালাল পাড়া, চৌগাড়ার পার গ্রামে ২০টিরও বেশি 'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' শীর্ষক কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালাগুলোতে প্রায় ২০০ জন নারী ও ২৫০ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ৪, ৫, ৬ নং ওয়ার্ড থেকে নার্গিস বেগম, মাহমুদা বেগম, মরিয়ম বেগম, শাহিনুর বেগম, ডালিয়া বেগম, রুশিয়া বেগমসহ ছয়জন নারী মর্জিনা বেগমের নেতৃত্বে 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

দুইবার রামপাল ইউনিয়নের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মর্জিনা বেগম তিনটি ওয়ার্ডের দশটি গ্রামের দশটি কাঁচা রাস্তা, সাতটি পাকা রাস্তা ও নয়টি পাকা ঘাটলা নির্মাণে ভূমিকা রাখেন। ২০১৩ সালে মর্জিনা বেগম তার তিনটি ওয়ার্ডের ১০টি গ্রামে ৬ জন গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভবতী কার্ড প্রদান করেন। ১০টি গ্রামে ৩০০টি বৃক্ষরোপণ করেন এবং সরকার ঘোষিত 'একটি বাড়ি-একটি খামার প্রকল্পে' ৬ নং ওয়ার্ডে ৬০ জন নারী এবং ৫ নং ওয়ার্ডে ১২০ জনকে সংগঠিত করেছেন তিনি, যাদের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ এবং ৮০ জন নারী। তারা প্রত্যেকেই দুই বছর মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তারা প্রত্যেকে দুইশ' টাকা করে সঞ্চয় করবেন এবং সরকার থেকে আরও দুইশত টাকা জমা হবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করতেই হেসে ওঠেন মর্জিনা বেগম। তিনি বলেন, নারীদের অবস্থা আরও ভালো করার জন্য আমাদের আরও অনেকদূর যেতে হবে। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হতে চান এবং দাঁড়াতে চান সমাজের নির্যাতিত নারীদের পাশে, তাদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থার জন্য তিনি প্রশিক্ষিত করতে চান সব নারীদের। ২০১৫ সালের মধ্যে নয়টি ওয়ার্ডের প্রতিটি গ্রামে নারী সংগঠন গড়ে তুলতে চান তিনি। তার সাথে সম্পৃক্ত করতে চান অন্তত এক হাজার নারীকে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স মর্জিনা বেগমের কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ যুগিয়েছে। তিনি আজ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। নারীদের অবস্থা পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সযত্নে লালন করছেন তার অস্তিমজ্জায়। অদম্য সাহস, দৃঢ় মনোবল আর কোনো কাজে নিবিষ্ট থাকার মানসিকতাই তাকে এ সফলতা এনে দিয়েছে।

সমাজ বদলানোর কর্মী খন্দকার উম্মে সালমা

জিল্লুর রহমান

সমাজ এগিয়ে যায় যাদের ব্যক্তিগত ত্যাগ ও মহান কর্মের মধ্য দিয়ে, যারা কিছু পাওয়ার আশা না করেই নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে চারপাশকে বদলে দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রয়াসে নিজেদের ব্রত করেন, এমনই একজন নির্ভীক কর্মী খন্দকার উম্মে সালমা।

১৯৬৭ সাল। এ বছর মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নে ডাউটিয়া গ্রামের খন্দকার আরশেদ আলী ও সুফিয়া খাতুনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সালমা। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তার অবস্থান চতুর্থ। পিতা-মাতার স্নেহে বেড়ে ওঠা সালমা মাত্র চার বছর বয়সেই বাবাকে হারান। পিতৃবিয়োগের এ ঘটনা কোমলমতি সালমার মনে গভীর রেখাপাত করে। শিশুসুলভ চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে শৈশবের বর্ণিল জগৎ তার কাছে উপস্থিত হয় কঠোর বাস্তবতায়।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম রৌহাদহে মামা-মামীর সংসারে আশ্রয় হয় সালমাদের পরিবারের। জীবন শুরু হয় নতুনভাবে। স্কুল, সমাজ, এমনকি পরিবারের কাছ থেকে তার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হতে থাকে যে, মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে তাকে ভিন্ন নিয়ম-সুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। ভাই ও বোনের খাবার-দাবার, লেখাপড়া, কাপড়-চোপড়ের মান একই রকম হবে না। এমনি এক প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে শুরু হয় তার লেখাপড়া। লেখাপড়ায় এগিয়ে যেতে থাকলেও অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বৈরি সামাজিক পরিবেশের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলে যেতে না পারার ক্ষতে আহত হয় সালমার জীবন।

এমনই এক অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে একই ইউনিয়নের ভাটবাউর গ্রামে সালমার বিয়ে হয়ে যায়। নারীত্বের স্বাভাবিক নিয়মে ১৯৮৭ সালে তিনি সন্তানের মা হন। কিন্তু অপার আকাঙ্ক্ষার মাতৃত্ব তার জন্য উৎসবের উপলক্ষ না হয়ে আসে অমানিশা হয়ে। কারণ পরিবারের অন্য সদস্যরা মনে করেন, সালমা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে পরিবারের জন্য অকল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছেন। শুরু হয় সালমার প্রতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন। উঠতে বসতে তাকে সহ্য করতে হয় কন্যা সন্তানের মা হওয়ার লাঞ্ছনা। স্বপ্নের সংসার সালমার কাছে বিষময় হয়ে উঠে এবং নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্বামীর গৃহে তার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে স্বামীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে সালমার ঠিকানা হয় বড় ভাইয়ের সংসারে।

শিশু কন্যাকে নিয়ে মুষড়ে পড়েন সালমা। চারদিকে অনিশ্চয়তার ঘোর অমানিশার মধ্যেও পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। বাড়িতে বিভিন্ন শ্রেণির বই সংগ্রহ করে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। উপার্জনের তাগিদে গৃহ শিক্ষকতার সাথে যুক্ত হন। তার নিজের জীবন থেকে তিনি বুঝতে পারেন– পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান না হওয়া পর্যন্ত নারীর মুক্তি আসবে না, আসবে না সমাজের উন্নয়ন। শিশুবিবাহ ও যৌতুক প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি তাকে ভাবিয়ে তুলে। নারী-পুরুষের মধ্যকার অহেতুক বৈষম্য দূরীকরণের পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। সময়ের পরিক্রমায় পদ্মা-গঙ্গার বহু জল বয়ে যায়, কিন্তু সালমার জীবন একই রকম রয়ে যায়।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। সংসদে পাশকৃত আইন অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রথমবারের মতো নারীদের সরাসরি

নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ ঘটে। পরিবার বিশেষ করে বড় ভাই খন্দকার আব্দুস সালামের অনুপ্রেরণায় খন্দকার উম্মে সালমা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এলাকাবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে তিনি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

শুরু হয় সালমার ইউপি সদস্য হিসাবে নতুন পথচলা। নিজের অনভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে আশপাশের মানুষগুলোর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে এক্ষেত্রেও তিনি তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা নেমে আসে, কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি।

ঠিক তখনই ২০০১ সালে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মুলজানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ৯৭তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। চার দিনের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেওয়া খন্দকার উম্মে সালমা কাজ ও চিন্তার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পান। নেতৃত্বের গুণাবলিতে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে মনোনিবেশ করেন নিজের চারপাশের ব্যাধি নিরাময়ে। শিশুবিবাহ, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে এলাকার জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে একর পর এক আয়োজন করেন উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান।

সালমার কাজের ফলাফলস্বরূপ এলাকার চেহারা বদলাতে আরম্ভ করে, মেয়েরা দলবেঁধে বিদ্যালয়ে যায়, অভিভাবকগণ শিশুবিবাহ ও যৌতুক বিষয়ে সচেতন হতে আরম্ভ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের সভাসহ অন্যান্য সামাজিক কাজে তার সরব অংশগ্রহণ বেড়ে যায়। তিনি দিঘী ইউনিয়নের প্রথম নারী সদস্য হিসেবে ভাটবাউর গ্রামের একটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের সভাপতির দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন এবং প্রশংসিত হন। ভিজিডি কার্ড বিতরণে তার স্বচ্ছতাকে উর্ধক্ষতন মহল দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে অন্যান্য এলাকায় তা তুলে ধরে। খন্দকার উম্মে সালমা পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সবগুলি ইউপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং প্রত্যেকটি নির্বাচনে জনগণের ভালবাসায় বিপুল ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দিঘী ইউনিয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করতে শুরু করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আয়োজিত ১৮৭০তম বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ও ১০৬তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ সালমার মধ্যে নতুন উদ্যম নিয়ে আসে। প্রশিক্ষণের পর তার এলাকায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন সূচক অর্জনে তার সহযোগী হিসেবে সাথে পান একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী। যাদের নিয়ে সালমা এলাকার জীর্ণ চেহারা বদলে দিতে ব্রতী হন। স্বেচ্ছাব্রতীগণ ওয়ার্ডভিত্তিক মাসিক সভায় মিলিত হয়ে এলাকার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করেন এবং তা দূরীকরণে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। নাগরিকদের সচেতনতার জন্য নাগরিকত্ব বিষয়ক কর্মশালা, 'প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সালমা নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরিতে সেলাই ও ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ বিষয়ক অনেকগুলো প্রশিক্ষণের আয়োজনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী-পুরুষের শিক্ষার সুযোগ তৈরিসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি ও ঝড়ে পড়া রোধে তিনি অবদান রেখে চলেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্যানিটেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অনেকগুলো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তার এলাকায়।

অব্যাহত কাজের মধ্য দিয়ে খন্দকার উম্মে সালমা তার এলাকার চিরচেনা চেহারাকে বদলাতে বহুলাংশেই সফল হয়েছেন। সফল হয়ে তিনি পরিতৃপ্ত নন। কারণ তিনি যে সমাজের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখার ব্রত নিয়েছেন।

নার্গিস পারভীন: জীবন সংগ্রামে সফল এক নারী

আমিরুল ইসলাম অন্তাম

শীতের শেষ বিকেল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছিল। এমনি এক পড়ন্ত বিকেলে মোটর সাইকেলযোগে দু জন যাত্রা শুরু করলাম। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহর থেকে আধা ঘন্টার পথ পেরিয়ে হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে পূর্বে ঠিক এক কিলোমিটার দূরে প্রধান সড়কের কাছাকাছি একটি স্থানে গিয়ে থামলাম। বুঝতে বাকি রইল না – আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে চলে এসেছি। আমার সহকর্মী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আসাদুল দেখালো – চাটাই-কঞ্চির বেড়া ঘেরা একটি ভাঙা চোরা আধা পাকা একটি বাড়ি। রাস্তা থেকে একটু নেমেই আসাদুল ডাক দেয়, আপা বাড়ি আছেন না কি? ভিতর থেকে উত্তর এলো, আছি ভাই – ভিতরে আসেন। দরজা ঠেলে ভিতরে যেতেই শুনতে পেলাম সেলাই মেশিনের ঘর্ ঘর্ শব্দ। মেশিনের উপর কিছু রঙিন বর্ণের ছিট কাপড়। ভাঙা কিন্তু গোছালো ছোট টিনের চালা দেয়া ঘরের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন একজন মধ্য বয়সী নারী। পাশেই বৃদ্ধা মা তার কাজে সহযোগিতা করছেন। ঘরের চৌকাঠে উঠে দাঁড়াতেই মেয়েটি হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বললো - ভাইয়া বসেন। উঠানে দেখতে পেলাম অনেকগুলো হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের একপাশে একটা চৌকিতে বসলাম। বৃদ্ধা মা ছুটে এসে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলো। কেমন আছেন আপনারা? জিজ্ঞেস করতেই হাসিমুখে তারা উত্তর দিলেন – আল্লাহ্ ভালই রাখছে। আপনারা তো ভালই আছেন, তবে বাড়ি ঘর করেন নি কেন? উত্তরে নার্গিস জানালেন, আগে ছেলে দুটোকে মানুষের মত মানুষ করবো তারপর বাড়ি বানাবো।

পাশাপাশি দুটি ঘর। ঘর দুটির মধ্যে তেমন কিছুই নেই। একটি ঘরের এক কোণে জীবন-যাপনের জন্য একটি চৌকি পাতা, কাপড় রাখার পুরানো একটি আলনা। নূন্যতম চাহিদামাফিক কাপড়-চোপড় গোছানো রয়েছে। অন্যদিকে একটি চেয়ারের উপর রয়েছে গ্রামের অশিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া গর্ভবতী মায়ের নিরাপদ প্রসব করানোর কিটবক্স। পরে জানতে পারলাম বৃদ্ধা মা একজন ধাত্রী মা। অশিক্ষিত হলেও দীর্ঘ ২০ বছর ধরে বহু মায়ের সন্তান প্রসব করিয়ে সকলের পরিচিত। মেয়েটি তারই সন্তান – স্বামীহারা বিধবা এক নারী – যিনি জীবনকে তুচ্ছ না ভেবে সাহস নিয়ে সংগ্রাম করে চলছেন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। জীবন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া এই সাহসী সৈনিকের নাম নার্গিস পারভীন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের মোল্লা পাড়া। উন্নয়নের সে রকম ছোঁয়া এখনও লাগেনি। লেখাপড়ার জন্য স্কুল গড়ে উঠলেও অসচেতনতার কারণে অনেক ছেলে-মেয়েই এখনো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তেমন কোনো ভূমিকা নেয়নি সচেতন মহল। বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার লুকোচুরি খেলায় পাড়ার সকলেই ঘুমিয়ে গেলেও ঘুমায় না নার্গিস। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সংসারের স্বচ্ছলতা আর দু ছেলের পোশাক পরিচ্ছদ ও লেখাপড়ার খরচ যোগাতে সেলাই মেশিনে কাজ চলে অবিরাম। সেলাই মেশিনের প্রতিটি সেলাইয়ের দাগ যেন তার মনে আঁচড় কেটে যায়। কখনও সুতা ছিড়ে যায়। নার্গিস ভাবেন – এভাবেই বুঝি জীবনের সুঁতা কেটে যায়। তখন সুতোকাটা ঘুড়ির মত কোথায় যেন হারিয়ে যায়। নার্গিস কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ঘন কুয়াশা কাটিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলোকছটা ছড়িয়ে দিতে যার আপ্রাণ চেষ্টা – তিনিই নার্গিস পারভীন।

আগেই বলেছি, নার্গিসের গ্রামের নাম ভাংবাড়ীয়া। এই গ্রামেই ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন নার্গিস। বাবার নাম মোঃ মনোয়ার হোসেন, মায়ের নাম ফুল ছুরাতন নেছা। নার্গিসের বয়স যখন দু বছর তখন বাবার সাথে মায়ের ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়। মায়ের বিনা অনুমতিতে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। মা ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে সতীনের সাথে সংসার না করে দু বছরের নার্গিসকে নিয়ে নানা-নানীর গ্রাম ভাংবাড়ীয়াতে চলে আসেন। সেই থেকেই নার্গিস নানী বাড়িতেই বড় হতে থাকেন। পাষাণ বাবা একদিনের জন্যও নার্গিসের খোঁজ নেয়নি। নার্গিস বাবা-মা থেকেও যেন এতিম। কিন্তু বাবার অভাব বুঝতে দেয়নি নার্গিসের কপাল পোড়া মা। পাখির পালকের মতো বুকের গভীরে কান্না চেপে রেখে তাকে লালন-পালন করেছেন তার মা। ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাংবাড়ীয়া গ্রামের মোল্লাপাড়ায় বড় হতে থাকেন নার্গিস। পাঁচ বছর বয়সে

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। মা ধাত্রী পেশায় কাজ করে সামান্য উপার্জন করে নার্গিসের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করতেন। খেয়ে না খেয়ে অভিমানী মা নার্গিসকে বড় করে তুলছেন।

এমনিভাবেই দিন কাটে, কেটে যায় রাত। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শেষে নার্গিস ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। লেখাপড়াতে ভালই ছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি খেলাধুলা, গান বাজনা, মোটকথা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান নার্গিস। এর ফলস্বরূপ অনেক পুরস্কারও অর্জন করেন তিনি।

নার্গিস তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলে যাওয়া আসার সময় চোখ পড়ে যায় একই গ্রামের মন্ডলপাড়ার আব্দুস সালামের। বিয়ের প্রস্তাব দেয় নার্গিসের মায়ের নিকট। বৃদ্ধা মা অভাবের তাড়নায় মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে বিয়েতে রাজী হয়ে যান। ১৯৯৬ সালে নার্গিস পারভীনের বিয়ে হয়ে যায়। জীবনের শূন্যতা পূরণ হয় তার। শ্বশুর বাড়িতে স্বামী সোহাগে ভালই কাটছিল তার জীবন। শ্বশুরের বড় পরিবার। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে স্বামী আব্দুল সালাম চতুর্থ সন্তান। কৃষিকাজ, যেমন – পান বরজ ও কলার আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন স্বামী আব্দুল সালাম। বিয়ের এক বছরের মাথায় নার্গিসের পিতা তার জন্য একটি সেলাই মেশিন কিনে আনেন। এমনকি মেয়ের সুখের জন্যে বিয়ের আসরেই নগদ ছয় হাজার টাকা যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে জামাতা তার ক্ষুদ্র ব্যবসা এগিয়ে নেবে – এই ভেবে প্রায় ৬০ হাজার টাকা অতিরিক্ত চাহিদা মোতাবেক যৌতুক পরিশোধ করেন।

বিয়ের এক বছর পর ১৯৯৭ সালে প্রথম সন্তানের জননী হন নার্গিস। ফুটফুটে ছেলে সন্তান যেন নার্গিসের ঘর আলো করে দেয়। নার্গিস আদর করে নাম রাখেন ইশতিয়াক আহম্মেদ। ২০০৪ সালে জন্মগ্রহণ করে দ্বিতীয় সন্তান তামিমুর রহমান রাবিক্ষ। দুই সন্তান যেন মানিক জোড়।

ক্ষুদ্র আয় রোজগার দিয়ে কোনরকম চলছিল নার্গিসের সংসার। মোটা চালের ভাত, কম দামের কাপড় পেয়ে বাবার অভাব অনেকটা ভুলেই গিয়েছিলেন নার্গিস। বাবা-মায়ের মনোমালিন্যের কথা ভেবে নার্গিস মাঝে মাঝে নির্ঘুম রাত কাটাতেন। মাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। বাবার ভালবাসা পেতে মায়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাঝে মধ্যেই বাবার সাথে দেখা করতে যেতেন।

ভালই কাটছিল নার্গিসের সংসার। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অন্ধকার নেমে আসে তার জীবনে। ২০০৯ সালে হঠাৎ একদিন জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে স্বামী আব্দুস সালাম প্রতিবেশীদের ওপর অভিমান করে বিষপানে আত্মহত্যা করে। অথৈ সাগরে পড়ে যান তিনি।

কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে নার্গিস জীবন সংগ্রামে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। ছেলেদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন তিনি। বর্তমানে বড় ছেলে ইশতিয়াক পাশ্ববর্তী হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়াশুনা করছেন। ছোট ছেলে রাবি চতুর্থ শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। জীবন জীবিকা এবং ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে নার্গিস কাপড় সেলাইয়ের পাশাপাশি মায়ের কিছু আবাদি জমি এবং কিছু বর্গা নেয়া জমিতে কলা, পান বরজ, ওল, গম ও সরিষার আবাদ করেন। লাভের টাকা দিয়ে নার্গিস সাড়ে ১৩ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন। বাড়িতে তিনটি গরু, সাতটি ছাগল ও দশটি মুরগি পালন করে সংসারের চাকা চলমান রেখেছেন। নার্গিস নিজে এসব দেখাশুনা করেন। এমনকি শ্রমিকদের সাথে তিনি নিজেও কঠোর পরিশ্রম করে চাষাবাদ করে থাকেন। বাড়িতে মায়ের নামে পৌনে নয় কাঠা জমি রয়েছে। নার্গিসের মা জানান, বাড়ির খোলা জায়গায় আলু, লালশাক ও পালং শাকের আবাদ করে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা মেটাচ্ছেন। বাড়িতে সব সময় গরুর দুধ পাওয়ার জন্য গাভী গরু পালন করা হয়। এই গরুর দুধ পরিবারের সবাই পান করে পুষ্টি চাহিদা মেটান। এমনি করেই চলছিলো নার্গিসের পারিবারিক জীবন।

এরকম অগ্রসর একজন নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসেন পাশ্ববর্তী ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য খবিরউদ্দীন (খবির মেম্বর)। তিনি নার্গিসকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন আমনজুলা বিল ব্যবস্থাপনা

সমিতির সদস্য হিসেবে যুক্ত করে নেন। তার আমন্ত্রণে ২০১২ সালে যশোর আর আর এফ ট্রেনিং সেন্টারে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ১১৩তম নারীনেত্রী ফাউন্ডেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নার্গিস।

নার্গিস জানান, প্রশিক্ষণ নেবার পর আমার চিন্তা-চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আমি বুঝতে পারি, শুধু আত্মন্নোয়ন কিংবা ঘর-সংসার নিয়েই নারীর জীবন নয়। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্যও সাধ্যমত কাজ করা প্রয়োজন।

এমন অনুধাবন থেকে নার্গিস স্থানীয় অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। ২০১২ সালে ৩৫ জন সমমনা নারী-পুরুষ সদস্যদের একত্রিত করে 'আমনজুলা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। এই সমিতির মাধ্যমে মাঠের ফসল উত্তোলনের জন্য রাস্তা নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, কালভার্ট নির্মাণ এবং ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ দেওয়া হয়। এ সমিতির সঞ্চয় থেকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে অনেক নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন। সমিতি পরিচালনা ও সমাজ উন্নয়নের নানা কাজে নার্গিসকে সহযোগিতা করছেন সাবেক ইউপি সদস্য, নারীনেত্রী আমেনা খাতুন। তার গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের অনেক মেয়ে – যৌতুক দিতে না পারার কারণে যাদের বিয়ে হচ্ছিল না – এ রকম ১৮ জন নারীকে তিনি সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছেন। পরবর্তীতে দক্ষতার কারণে যৌতুক ছাড়াই এসব নারীদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব কাজের কারণে নার্গিস অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

একজন নারীনেত্রী হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নয় জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, পাঁচ জন ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করা এবং চার জন শিশুকন্যার শিশুবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করেছেন নার্গিস। পাশাপাশি যৌতুক প্রতিরোধেও কাজ করছেন নার্গিস। এছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলছেন। বিশেষ করে ২০১২ সালের শেষের দিকে গাংনী এরিয়া অফিসে দু দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নার্গিস পারভীন পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তার একজন সহায়ক প্রশিক্ষক হিসেবে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পাক্ষিক উঠান বৈঠক করে নারীদের মাঝে আশার আলো প্রজ্জলিত করছেন ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাইলে নার্গিস জানান, তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করতে চান। তিনি ভাংবাড়ীয়া গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত ও শিশুবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়তে তুলতে চান। সর্বোপরি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলে সমাজ বদলে অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি। এছাড়া সন্তান দুটোকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

নার্গিস পারভীন এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী এবং একজন সফল নারীনেত্রী। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ একটি পর্যায়ে আসতে পেরেছেন। তার মনোবল বেড়েছে। এ মনোবল আর স্থানীয় জনগণের ভালবাসা নিয়ে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চান তিনি। নার্গিস বিশ্বাস করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন – তবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন একদিন বাস্ত বায়িত হবেই।

সমাজ গড়ার কারিগর বিষ্ণুপুরের লাইলী পারভীন

মোঃ গিয়াস উদ্দিন

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবনের গা ঘেঁষে ছোট একটি জেলা সাতক্ষীরা। এ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম নীলকণ্ঠপুর। ১৯৮৩ সালের ২৩ নভেম্বর এই নীলকণ্ঠপুর গ্রামের দরিদ্র একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মোছাঃ লাইলী পারভীন। গ্রামের সবাই লাইলী বলেই ডাকে তাকে। পিতা-মাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে লাইলী তৃতীয়। পিতার নাম মহিউদ্দীন রহমান এবং মাতা আজিজুন্নাহার।

ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ার প্রতি ছিল লাইলীর প্রবল আগ্রহ। বান্ধবীদের সাথে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া কওে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পেতেন তিনি। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলও করেন লাইলী। কিন্তু নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্তে পার্শ্ববর্তী বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের একটি যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। অত্যন্ত দরিদ্র এবং আর শিশুবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে তার মা-বাবা জীবনের মানে বুঝে ওঠার আগেই লাইলীকে ঠেলে দেন সংসার জীবনে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী লাইলী শশুরবাড়িতে এসে বুঝতে পারেন, হেসে খেলে বিদ্যালয়ে যাওয়া আর সংসার করার মধ্যে কতটা পার্থক্য। বিয়ের ছয় মাস পার হতেই লাইলী বুঝতে পারেন যে, তিনি মা হতে চলেছেন। এ সময় সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম তার ওপর ন্যস্ত হওয়ায় লাইলীকে দিন রাত পরিশ্রম করতে হতো।

লাইলী তার স্বামীকে খুবই ভালবাসতেন। যখন যা বলতেন স্বামীর সমস্ত আদেশ পালন করার চেষ্টা করতেন। বিয়ের প্রথম ছয় মাস স্বামীও লাইলীকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু ধীরে ধীরে স্বামীর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করেন লাইলী। তার স্বামী একজন দিনমজুর। সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায়, তার স্বামী অনেক রাত করে ঘরে ফেরে। লাইলী রাতের খাবার না খেয়ে স্বামীর জন্য রেখে দেন, ভাবেন দু জন একসাথে খাবেন। কিন্তু মধ্যরাতে স্বামী এসে যখন বলে– আমার ক্ষিদে নেই, তখন ক্ষুধার কষ্টের চেয়ে মনেই বেশি কষ্ট অনুভব করেন লাইলী। তিনি জানতে পারেন, তার স্বামী একদল বখাটে ছেলের সাথে আড্ডা দেয়, মদ খায় এবং জুয়া খেলে।

লাইলীর গর্ভের সন্তান দুনিয়াতে আসার দিন যতই কমতে থাকে, তার স্বামীর কু-কর্মও ততই বাড়তে থাকে। নেশার চাহিদা মেটাতে তার স্বামী লাইলীর বাবার দেয়া বিয়ের গহনাও বিক্রি করে ফেলে। এরই মধ্যে লাইলীর কোল জুড়ে আসে এক ফুটফুটে সন্তান। সন্তান এলেই তো আর হবে না, স্বামীর খুশির জন্য একে হতে হবে পুত্র সন্তান। কিন্তু লাইলীর হয়েছে কাল। কন্যা সন্তান হওয়ায় স্বামীকে নিয়ে তিনি আরও দুশ্চিন্তায় পড়েন। কারণ তার স্বামীর এক কথা, কন্যা সন্তান হলো সমাজের বোঝা, কোন আয় রোজগার করতে পারে না।

দিন যতই বাড়তে থাকে লাইলীর উপর তার স্বামীর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন স্বামীর অত্যাচার এতটাই বেড়ে যায় যে তার পক্ষে আর কোনভাবেই সংসার করা সম্ভব না। এ সময় স্বামীকে খুশি করতে এবং তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে বাবার বাড়ির শেষ সম্বল পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করে দেন লাইলী। কিন্তু ‘বিধির লিখন, যায় কি খণ্ডন’। বিধাতা যেন তার কপালে সংসারের সুখ রাখেননি। শত চেষ্টা করেও যখন স্বামীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন, তখন বাধ্য হয়েই তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়ি চলে আসেন। কিন্তু আসলেই তো আর হবে না। উঠবেন কোথায়? খাবেন কী? তার ওপর আবার তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে। হঠাৎ মনে পড়লো তার বড় বোনের কথা। পাশের গ্রামে বিয়ে হওয়া তার বড় বোনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ঘর ভাঙা এক দুঃখী নারী লাইলী।

লাইলীর বোন জামাই ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন এবং তিনি ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির একজন সদস্য। লাইলীর জীবনের সমস্ত কথা শুনে তিনি লাইলীকে আত্মশক্তি জাগ্রত করতে বললেন। বললেন, 'আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না।' দুলাভাইয়ের এই কথাগুলো শুনে অর্থ বুঝতে প্রথমে একটু সমস্যা হলেও লাইলীর প্রবল আগ্রহ হলো এমন সুন্দর বাণী দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়ার। দুলাভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, কিছুদিন আগে তাদের ইউনিয়নের সাথে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি চুক্তি সম্পদিত হয়েছে। যে চুক্তির উদ্দেশ্য হলো– ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের নারীদেরকেও তাদের অধিকার ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করা। লাইলীর প্রবল ইচ্ছা জাগে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার। এর কিছুদিন পর ২০১২ সালের ২ জুন বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে আয়োজিত চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৮৯১তম) অংশগ্রহণ করেন লাইলী।

প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করে আত্মশক্তি বাড়ানো সংক্রান্ত তার দুলাভাইয়ের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এর কিছুদিন পর ৭ জুন সাতক্ষীরা শহরের পিটিআরসি ট্রেনিং সেন্টারে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত ৯৩তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাইলী নারীর অধিকার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন।

প্রশিক্ষণ দুটি গ্রহণ করার পর লাইলী নিজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেন। দরিদ্র বলে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, দারিদ্র্যের জন্য নিজেকে দোষারোপ করার চিন্তা পরিহার করে এ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। তিনি তার ৯নং ওয়ার্ডের উজ্জীবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তারা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কয়েক মাস পর লাইলী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক আয়োজিত একটি সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। দুটি সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করে লাইলী প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা আয় করেন।

নিজেকে আরও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে লাইলী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে এসএসসি পাস করেন। এখন একাদশ শ্রেণিতে লেখাপড়া করছেন। স্থানীয় উজ্জীবক ও নারীনেত্রীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং সাধ্য অনুযায়ী এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সমাজের দরিদ্র অবহেলিত নারীদের সংগঠিত করে তিনি একটি সঞ্চয়ী সমবায় সমিতি গঠন করেন। সমিতির নাম দেন 'নীলকণ্ঠপুর নারী উন্নয়ন সমিতি'। এই সমিতিতে ৪০ জন দরিদ্র নারী প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করে। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি সমিতির মাসিক সভায় তারা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন, শিশুবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও স্যানিটেশন ইত্যাদি সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা তা নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের ওয়ার্ডকে শিশুবিবাহ ও যৌতুকমুক্ত ঘোষণা করার জন্য ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যকে সভাপতি করে ৯নং নীলকণ্ঠপুর শিশুবিবাহ ও যৌতুকমুক্ত ওয়ার্ড কমিটি গঠন করেন। এরপর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সভায় ইউপি চেয়ারম্যান ৯নং ওয়ার্ডকে শিশুবিবাহমুক্ত ওয়ার্ড হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন। লাইলী শুধু এসব কাজ করেই থেমে থাকেননি বরং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রায় সমস্ত সামাজিক সংগঠনের সাথে কম বেশি জড়িত রয়েছেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য।

লাইলী পাড়ার দরিদ্র অসহায় শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সভায় অভিভাবকদের উপস্থিত করে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন ছেলে মেয়েকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি এবং ১০ জন ঝরে পড়া ছেলে-মেয়েকে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় তার উদ্যোগে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে, যেখানে ৪০ জন নিরক্ষর মানুষ স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। লাইলী নিজে শিশুবিবাহ শিকার হয়েছেন, মা হয়েছেন অল্প বয়সে – এসব স্মৃতিগুলো আজও তিনি ভুলতে পারেননি। তাই তার মত আর কোন মেয়েকে যেন অল্প বয়সে মা হয়ে অপুষ্টির শিকার না হতে হয় সেজন্য তিনি নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠক ও কর্মশালা পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে লাইলীকে আরও ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই কর্মশালার মাধ্যমে লাইলী হাতে কলমে মা, শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি ও তাদের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারেন। এ প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার ওয়ার্ডে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। ৬০ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছেন তিনি।

গ্রামের মা-বোনদের কাছে লাইলী এখন অত্যন্ত কাছের একজন মানুষ। ওয়ার্ড, গ্রাম এমন কি ইউনিয়নের প্রায় সবাই লাইলীকে এক নামে চিনতে পারে। লাইলীর জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা। যার ফলে লাইলী আজ একটি বেসরকারি সংগঠনের স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে চাকুরির সুযোগ লাভ করেছেন। এই চাকুরি থেকে তিনি প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা বেতন পান।

ছুটির দিনও লাইলী বসে থেকে সময় নষ্ট করেন না। ছুটির দিন তিনি একটি বেসরকারি সংগঠনের অনুদানে গড়ে ওঠা একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। যে বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০-৪০ জন ভূমিহীন পরিবারের ছেলে-মেয়েকে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। নিজের সন্তানকেও ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন লাইলী।

লাইলী পারভীনের এই পথ চলা এখন শুধুই সামনের দিকে। তিনি মনে করেন, তার নিজের জীবনে আজ সফলতা এসেছে তা সম্ভব হয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণে কারণে। লাইলী এখন তার সন্তান এবং সমাজের অন্যান্য অসহায় মানুষগুলোকেও আত্মনির্ভশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন, এটাই তার প্রত্যাশা। সে লক্ষ্যেই তিনি নিরলসভাবে আজও কাজ করে যাচ্ছেন।

মঞ্জু রাণী সোমঃ বলিষ্ঠ এক নারীনেত্রীর নাম

মনিরুজ্জামান মোল্লা

মঞ্জু রাণী সোম। জন্ম ২০ জানুয়ারি, ১৯৭০। বাগেরহাট উপজেলা সদরের কাড়াপাড়া ইউনিয়নের গোমতি গ্রামে। দরিদ্র বাবা কালীপদ মন্ডল। এক ভাই, মঞ্জুসহ দু বোন এবং মা-বাবা মিলে পাঁচ জনের সংসার। বাবা কৃষিকাজ করে অভাবে অনটনে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন। পরিবারের অভাব অনটন এবং মেয়ে হওয়ার কারণে জন্মের পর থেকে মঞ্জু পেয়েছেন অনাদর আর অবহেলা।

বাড়ির কাছেই গোমতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় মঞ্জুর লেখাপড়া। এ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন তিনি। এরপর বেকে বসলেন মা-বাবা। মেয়েকে আর পড়াবেন না। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে মঞ্জু রাণীর মাথায়। তিনি বুঝে ওঠতে পারেন না কী তার অপরাধ। তার বিয়ের কথা উঠতে থাকে এ সময়। অথচ মঞ্জু রাণীর একান্ত ইচ্ছা সে অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবেন। উপায়ন্তর না দেখে বাড়ির কাছে মামাকে গিয়ে ধরেন এবং তার মনের কথা খুলে বলেন। মামার সহায়তায় সে যাত্রায় রক্ষা পান মঞ্জু রাণী।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে গিয়ে ভর্তি হন শরৎচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আর এখান থেকেই এএসসি পাশ করেন তিনি। আবারও সেই উটকো ঝামেলা। মা-বাবা উঠে পড়ে লেগেছেন – তাকে আর পড়াবেন না, বিয়ে দিয়ে দেবেন। ততদিনে মামাও বেঁচে নেই। জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার বাসনায় এবার মঞ্জু রাণী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন পরিবারের প্রতি। মা-বাবার বিনা অনুমতিতেই বাগেরহাট শহরে গিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন খানজাহান আলী মহাবিদ্যালয়ে। লেখাপড়ার খরচ চালাতে শুরু করলেন প্রাইভেট টিউশনি। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা মা তার পড়ালেখা মেনে নেন। গভীর অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ মঞ্জু রাণী খানজাহান আলী মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি পাশ করেন। বিএ-তে ভর্তি হন সরকারি পিসি কলেজে। বিএ চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন তিনি।

বিএ পাশের পর মঞ্জু রাণী চাকুরির চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের ফের আর পদ খালির অভাবে একটা ভালো চাকুরি যোগাড় করতে পারলেন না তিনি। এ সময় প্রায়ই হতাশায় ভুগতেন তিনি। হতে হতেও যখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিটা হলো না, তখন তার হতাশা আরও বেড়ে যায়। এদিকে সংসারে মা-বাবা মেয়েকে বিয়ে দিতে ব্যস্ত। কিন্তু কোনো ভালো পাত্রের সন্ধান পাচ্ছেন না।

দেখতে দেখতে কুড়ি পার হওয়া মঞ্জু রাণী সংসারের বোঝায় পরিণত হন। কি করবেন তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। এ সময় তার পরিচয় হয় দিলীপ সোম নামের এক যুবকের সাথে। পরিচয় থেকে পরিণয়। অবশেষে সবার অমতে তাদের বিয়ে হয়। এতে সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বেকার স্বামী, তার উপর তিন কূলে কেউ নেই দিলীপ সোমের। তাই শশুর বাড়ি গিয়ে ওঠাও হলো না মঞ্জু রাণী সোমের। বাধ্য হয়ে বাবার সংসারেই থেকে যেতে হলো।

নানা সমস্যায় জর্জরিত মঞ্জু রাণী সোম দমে যাওয়ার পাত্রী নন। সংসারের খরচ যোগাতে প্রাইভেট টিউশনি করা শুরু করেন। এই সময়ে তিনি সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর গ্রামের মেয়েদের জামা কাপড় বানিয়ে তার আয় দিয়ে সংসার চালাতে থাকেন। এর মধ্যে দু সন্তানের জননী হন মঞ্জু রাণী। মেয়ের নাম রাখেন পিংকি সোম আর ছেলের নাম রাখেন সুদীপ্ত সোম।

দিনে দিনে দিন বয়ে যায়। পরের কাহিনী এক সংগ্রামী নারীর সফলতার কাহিনী। সংসারে যখন সচ্ছলতা ফিরে এলো ততদিনে বেকার স্বামী ব্যবসা করতে শুরু করেছেন। মূলধন যোগাড় করে দেন মঞ্জু রাণী। শুধু তাই নয়, এ সময় তিনি আয়ূর্বেদীয় কলেজে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সাথে পাশ করার পর খুলে বসেন আয়ূর্বেদীয় চিকিৎসালয়। একজন সুচিকিৎসক হিসেবে এলাকায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। আয়ও ভালো হতে থাকে। এক খণ্ড জমি কিনে আলাদা বাড়িতে গিয়ে ওঠেন মঞ্জু

রাণী। এ সময়ে নানা সামাজিক কাজেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। মঞ্জু রাণী গোমতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শরৎচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

২০১২ সালের কথা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বিপুলা রাণী পাল তাকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণে খুলনা সিএসএস-এ ৮৩তম নারীনেত্রী ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন মঞ্জু রাণী। প্রশিক্ষণে এসে তার পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে। ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দর্শন অর্জন করেন তিনি। একজন নারী হিসাবে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তার চেতনায় খুলে যায় নতুন দিগন্তের সিংহ দ্বার। মানুষের জন্য – বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত নারীদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এলাকার নারীদের শোনাতে শুরু করেন নারীর ক্ষমতায়নের অমোঘ মন্ত্র। উজ্জীবিত মঞ্জু রাণী সোম এলাকার অবহেলিত নারীদের সংগঠিত করেন। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে শুরু করেন সেলাই (দর্জি) প্রশিক্ষণ। অবসরে সেলাই আর হাতের কাজ শেখান তাদের। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে গ্রামীণ নারী দর্জি বনে যান। নারীদের জামা কাপড় বানিয়ে আয় করতে শুরু করেন তারা। এই নারীদের নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখান থেকে পড়াশুনা করে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছেন ঝর্ণা পাল, সবিতা মন্ডলসহ আরও অনেকে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি তিনি তাদের নিরাপদ মাতৃত্ব, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, শিশুদের শতভাগ মাতৃদুগ্ধ পানসহ নানা বিষয়ে সচেতন করে তোলেন।

মঞ্জু রাণী সোম সংগঠিত এই নারীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে যৌতুক ও শিশুবিবাহ বন্ধে প্রচারণা শুরু করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বন্ধ হয় প্রফুল্ল পালের মেয়ে লিপি পালের শিশুবিবাহ। বিশুদ্ধ পানি পান এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে এলাকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। তার প্রচেষ্টায় শতভাগ স্যানিটেশন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে গোমতি গ্রাম।

শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধেও ভূমিকা রাখছেন মঞ্জু রাণী। তার প্রচেষ্টায় অরুন রায়ের ছেলে অনুরুদ্ধ রায় এবং রাধা পালের মেয়ে পিংকি পাল আবার বিদ্যালয়ে ফিরেছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মঞ্জু রাণী সোমের কারণে জোড়া লাগে হালিমার ভেঙে যাওয়া সংসারে। এখন তিনি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে প্রায়ই ডাক পান পারিবারিক বিবাদ মিমাংসার জন্যে। গোমতি এলাকায় এতদিন একজন চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এখন একজন অনুকরণীয় নারীনেত্রী হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছেন তিনি।

এলাকার হতদরিদ্র নারীদের নিয়ে গোমতি মহিলা সঞ্চয় সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন মঞ্জু রাণী। এই সমিতির সঞ্চিত অর্থ ঋণ হিসেবে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে নানা আয়মুখী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে জানান তিনি। সমিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত দু দফা বৈঠক করেছেন তিনি। সাড়াও পেয়েছেন প্রচুর। তার স্বপ্ন – নারীরা হবে শিক্ষিত, আয়ক্ষম এবং স্বাস্থ্য সচেতন। আর কোনো নারী হবে না যৌতুক কিংবা শিশুবিবাহের শিকার।

মঞ্জু রাণী নিজের সন্তান দুটোকেও সুশিক্ষায় গড়ে তুলেছেন। মেয়ে পিংকি সোম সম্মান (অনার্স) শেষ বছরের (ফাইনাল ইয়ার) ছাত্রী। ছেলে সুদীপ্ত সোম একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। মঞ্জু রাণী সোম সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় স্বামীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন সব সময়। তিনি তার কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিণত হয়েছেন এক বলিষ্ঠ নারীনেত্রী হিসেবে। তিনি মনে করেন, সকল নারী যদি সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসেন, তবেই ত্বরান্বিত হবে নারীর ক্ষমতায়ন।

সফলতার ছোঁয়ায় উদ্ভাবিত লিপি আক্তার
আনিসুর রহমান

পাহাড়ের কোলঘেষে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার একটি গ্রাম চৈত্রংপুর। উপজেলা শহর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে চৈত্রংপুর গ্রাম, যেখান থেকে ভারতের সীমানা আর উঁচু সব পাহাড় দেখা যায়। গ্রামটি হাওর এলাকায়, বছরের প্রায় আট মাসই পানিতে ডুবে থাকে। দেখে মনে হয় চারিদিকে অসীম সাগর, মাঝে স্বপ্নের মতো কিছু বাড়ি ঘর ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৯৭৭ সালে এ গ্রামের মোঃ সিরাজ উদ্দিন মন্ডল ও হাসনাহেনার ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যাশিশু। মা-বাবা আদর করে নাম রাখেন লিপি লিপি।

সত্যবাদিতা, ডানপিটে ও সাহসিকতার জন্য বাল্যকাল হতেই লিপি তার এলাকায় পরিচিত। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মাত্র ১৪ বছর বয়সে নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বিয়ে হয়ে যায় একই উপজেলার যুবক শাহ জাহাঙ্গীর কবিরের সাথে। স্বামী সৈনিক হিসেবে চাকুরি করতেন ময়মনসিংহ সেনানিবাসে। কিছুদিন পর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সহকারী ভূমি জরিপ কর্মকর্তা হিসেবে কলমাকান্দা ভূমি অফিসে যোগদান করেন।

লিপি এবং তার স্বামীর ছিল লেখাপড়ায় প্রতি প্রবল আগ্রহ, তাই বিয়ের পর লিপি আবার লেখাপড়া শুরু করেন। গভীর অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ লিপি এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেন। চাকুরি নেন একটি এনজিওতে। এলাকার আরও কিছু নারীসহ গঠন করেন একটি সঞ্চয় ও আয়মুখী সমিতি। চাকুরি করাকালীন লিপি এলাকাবাসীর কাছ থেকে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হন। হয়ে যান নানান প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। স্বামীর পরামর্শে চাকুরি হতে অব্যাহতি নেন। এ সময় তার ঘরের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

ডানপিঠে সেই বালিকাটি বদ্ধঘরে ছটফট করতে থাকে। কীভাবে সে এ প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ছিন্ন করবে। এ সময় তার শিক্ষিকা শিপ্রা পাল – যিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর উজ্জীবক – তার হাত ধরে ২০০৬ সালে কলমাকান্দা বিআরডিবির হলরুমে চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণে ‘আত্মশক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না’ এবং একটি গানের কলি ‘নারী তোমার বাড়ি কই’ এ দুটি বাক্য তার মনকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। এরপর আর কোন প্রতিবন্ধকতাই তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি বুঝতে পারেন, যোগ্যতা অর্জন ছাড়া তিনি কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। এরপর ওর্য়াল্ড ভিশন, স্যাপ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যখন যে প্রশিক্ষণ বা কর্মশালা আমন্ত্রণ পেয়েছেন তাই সাদরে গ্রহণ করে অংশগ্রহণ করেছেন।

আর্থিক উর্পাজন ও সঞ্চয়ের পাশাপাশি লিপি তার একান্ত ইচ্ছায় গড়ে তোলেন সামাজিক আন্দোলন, পারিবারিক সঞ্চয়, এলাকায় সৃষ্টি করেন নাগরিক আন্দোলন, যার ধারাবাহিকতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় আয়োজন করেন সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক, মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও র‌্যালি। কথা বলেন নারী অধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে। এরফলে তিনি হুমকি হয়ে ওঠেন ধর্ম ব্যবসায়ীদের, যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মের নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করতো।

একটি ঘটনা তাকে সমাজে নারীনেত্রী হিসেবে ও বলিষ্ঠ নারী কণ্ঠ হিসেবে পরিচিতি দেয়, সেটি হলো– ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থায়নে তাদের গ্রামে একটি মাদরাসা স্থাপিত হয়। প্রতিবছর ঐ মাদরাসায় বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। উক্ত ওয়াজ মাহফিলে বিভিন্ন এলাকা হতে ওয়াজ করার জন্য আলেম তথা হুজুর আসতেন। তখন ওয়াজের এক পর্যায়ে এক হুজুর বলছিলেন যে, বিধর্মীরা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীদের পর্দা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছে, যা নারীদের চরিত্রহীন করে তুলছে। তিনি (হুজুর) আরও বলেন, লিপির কারণে এলাকার অনেক মেয়ে এখন বাইরে গিয়ে কাজ করছে, পর্দা আব্রু মেনে চলছে না। কাজের নামে বিধর্মী কাজ হচ্ছে। মেয়েদের তথা নারীদের নামে এ ধরনের

কলঙ্ক লেপন লিপিকে বিদ্রোহী করে তোলে। নারী তথা মায়ের জাতিকে অবজ্ঞা করায় লিপি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে আরও অনেকের সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তার প্রতিবাদের কারণে ঐ হুজুর তখনি ওয়াজ বন্ধ করতে বাধ্য হন।

এভাবে শুরু হয় লিপির আত্মপ্রকাশ। তখন তার মতো নারী যারা সমাজ উন্নয়নে কাজ করতো তাদের বিভিন্ন ধরনের অবজ্ঞামুলক কথাবার্তা বলা হত। সামাজিকভাবে হেয় করা হত। যেসব মেয়ে চাকুরি কিংবা বিভিন্ন সমিতি ও এনজিওতে কাজ করতো তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হতে হত। এ সময় মেয়েকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে লিপিকে ছায়ার মত আগলে রাখেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন বাবা সিরাজ উদ্দিন মন্ডল। তাকে আরও সহযোগিতা করেন তার দুই বোন শিল্পী ও শাপলা এবং তার শিক্ষিকা শিপ্রা পাল। আত্মশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে এবং নারী তোমার বাড়ি কোথায় এ কথাগুলিকে পাথেয় হিসেবে নিয়ে চাকুরি করে অর্থ সঞ্চয় করে কলমাকান্দা সদরে লিপি তার নিজ নামে একটি পাকা বাড়ি তৈরি করেন।

লিপি বলেন, সমাজের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি আমরণ কাজ করে যাবেন। তার স্বামীও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তাকে উৎসাহ প্রদান করেন, সহযোগিতা করেন বিভিন্ন জটিল কাজের সমাধানে। এলাকাবাসী তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন মানবিক ও নারী অধিকার আদায়ে লিপির সহযোগিতা নেন। যারা আগে তার কাজে বাধা প্রদান করত তারাই আজ তাকে অনুসরণ করছে – ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুষ্ঠ সুন্দর সমাজ ও দেশ উপহার দেওয়ার জন্য।

অবহেলিত নারীদের সহায় মাহমুদা আক্তার

এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন

আটপাড়া শুনলেই মনে হয় আটটি পাড়া নিয়ে গঠিত একটি স্থান। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এটি নেত্রকোনা জেলার একটি উপজেলার নাম। এ উপজেলার থানা সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বের একটি গ্রাম পাহাড়পুর। এ গ্রামেই বসবাস করেন নারীনেত্রী মোছাম্মদ মাহমুদা আকতার। ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তবে বাবা-মায়ের সাথে তার বাল্যকাল কাটে নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলায়।

মাহমুদার বাবা ছিলেন হাজ্বী এ. কে.এম. আলিম উদ্দিন বানিয়াজান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু দীর্ঘদিন বাবার স্নেহ পাবার সুযোগ পাননি তিনি। ১৯৭২ সালে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মাহমুদার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পরিবার মদন উপজেলা হতে আটপাড়ায় ফিরে আসে। মাহমুদা আটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হন দুগ্রাশ্রম গার্লস হাই স্কুলে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৭৯ সালে আটপাড়ার পাহাড়পুর গ্রামের মোঃ আবুল কাসেমের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পেশায় মোঃ আবুল কাসেম পেশায় ছিলেন চাকুরিজীবী। বিয়ের পর নিজের প্রচেষ্টায় অষ্টম শ্রেণি পাশ করলেও সংসারের কাজের চাপে এরপর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের পর একে একে ছয় সন্তানের জননী হন তিনি ।

১৯৯০ সালে স্বামী অসুস্থ হয়ে বাড়িতে চলে আসে। সাথে সাথে সংসারে নেমে আসে আর্থিক দৈন্যতা। অথচ সংসারে প্রতিদিন আট জন মানুষের আহার যোগাড় করতে হয়। তার স্বামী কৃষি তথা চাষাবাদের পাশাপাশি স্থানীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। কিন্তু চাষাবাদের স্বল্প আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৯২ সালে পারিবারিক সম্মতি নিয়ে মাহমুদা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে এক বছর সেলাই প্রশিক্ষণ করেন। এরপর সেলাই কাজ করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (বিআরডিবি) থেকে ঋণ নিয়ে তিনি কিছু জমি বন্ধক নিয়ে সংসারের আর্থিক দূরবস্থা দূর করতে চেষ্টা করেন। মাহমুদা ১৯৯৩ সনে বিআরডিবি'র নির্বাচনে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। এ পদের সম্মানী ভাতা বাবদ তিনি প্রতিমাসে একহাজার টাকা পেতেন। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি আবারও বিআরডিবি'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৯৪ সালে মাহমুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মৎস চাষের ওপর একটি প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণটিকে পুঁজি করে জীবিকা নির্বাহের সহায়ক পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে জীবনে চলার পথ শুরু করেন। প্রথমে একটি পুকুরে শুরু করেন মাছ চাষ। এতে তার মাসে গড়ে (প্রতি মৌসুমে) চার হাজার টাকা আয় হয়। মাছ চাষের পাশাপাশি তিনি হাঁস-মুরগি পালন ও সবজি চাষ করেন। নারী হিসেবে এসব কাজ করতে কখনও তিনি লজ্জাবোধ করেননি।

২০০৪ সালে মাহমুদা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারেন এ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবি মোঃ রুহুল আমিনের কাছে। তার পরামর্শে ২০০৪ সালে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং ২০০৫ সালে ময়মনসিংহের স্পন্দন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে (৫ম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন তিনি।

নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নারীর অধিকার ও উন্নয়নমূলক কাজ ও কাজের নীতিমালা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা সৃষ্টি হয় এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য কিছু করার জন্য তাগিদ অনুভব করেন। তিনি ভাবেন, তিনি আর একা নন।

প্রশিক্ষণের পর তিনি তার এলাকায় শিশুবিবাহের কুফল, যৌতুকের ক্ষতিকর দিক ও ইভটিজিং বন্ধে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। মানুষকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি এসব প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। শুধু প্রচারাভিযান পরিচালনাই নয়, তিনি এ পর্যন্ত প্রায় ২০টি শিশুবিবাহ বন্ধে ভূমিকা পালন করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো তাকে আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন ভয় কাজ করেনি। কারণ তিনি জানেন, তিনি সত্যের পথে লড়াই করছেন। মাহমুদা ৩০ জন দরিদ্র মহিলাকে সরকারি আইনগত সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে মামলা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সুবিচার আদায় করেছেন। এর ফলে ১৫ জন নারী আজ স্বামীর সাথে সুখেই সংসার করছেন। গ্রামের সালিশের মাধ্যমে তিনি প্রায় ৪০টি দাম্পত্য কলহ নিরসন করেছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ অসহায় দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন, যার ফলশ্রুতিতে অসহায় দরিদ্র মানুষ পূর্বের চেয়ে সেখানে ভাল সেবা পাচ্ছেন।

মাহমুদা মনে করেন, অশিক্ষার কারণে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার জন্ম নেয়। তাই তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা গেলে তারা সামাজিকভাবে সচেতন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য গণশিক্ষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি ও তার মেয়ে বিনামূল্যে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়গামী করতে বিভিন্ন আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন তিনি। এর ফলে আজ পাহাড়পুর গ্রাম তথা আটপাড়ায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা খুবই কম।

সমাজ সেবামূলক কাজের কারণে নেত্রকোনার সকল প্রশাসনের সাথে তার একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আইনগত কাজে সকল সরকারের সময় তিনি প্রশাসনের কাছ থেকে সহযোগিতা পান। আর এ সহযোগিতাই আরও বেশি পরিমাণে তাকে মানুষের সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

স্থানীয়ভাবে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে তিনি একটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সম্প্রতি তিনি একটি মুরগির খামার চালু করেছেন। যেখানে পাঁচ জন নারী কাজ করছে। আজ তিনি নিজে এক জন স্বাবলম্বী নারী। তিনি চান, সমাজের সকল নারী স্বাবলম্বী হয়ে তাদের অধিকার অর্জনের ব্যাপারে সচেতন হোক।

মাহমুদা তার সন্তানদেরও লেখাপড়া করিয়েছেন। কখনো তাদের কষ্ট বুঝতে দেননি। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। দু ছেলে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে বেসরকারি ফার্মে চাকুরি করছে।

মাহমুদা মনে করেন, তার মত প্রতিটি মানুষ যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে, তাহলে আমরা পাব কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যাধিমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ তথা দেশ। তখন আমরা গর্ব করে বলতে পারবো–
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

রেহেনা আক্তার মনি: সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে যা পথচালা

খায়রুল বাশার

গুজাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র-এর (ইউআইএসসি) উদ্যোক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রেহেনা আক্তার মনি। হালকা পাতলা গড়নের, হাসি-খুশি মেয়ে। উচ্চতায় বেশি নয়। চোখের সামনে অন্যায় কোন হতে দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ করেন। এজন্যই সবার কাছেই প্রিয় তিনি। ছোট বড় সকলেই মনিকে পছন্দ করে তার স্বভাব সুলভ আচরণের কারণে।

বাবার কর্মস্থলের সুবাধে মনির জন্ম শেরপুরের এটিআই কোয়ার্টারে। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে মায়ের কোল আলোকিত করে পৃথিবীতে আসে তিনি। বাবার নাম মোঃ আব্দুর রহমান। পেশায় (অবসরপ্রাপ্ত) সরকারি কর্মকর্তা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরির পুরো সময়টা কাটান শেরপুর জেলায়। প্রথম স্ত্রী আইমন বিবির বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি তার স্বামীকে আবার বিয়ে করার প্রস্তাব ও অনুমতি প্রদান করেন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন হোসনে আরা বেগমকে। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির জায়গায় কখনও পরিবারে দু জনের মাঝে কোনো সময়ই ভুল বুঝাবুঝি হয়নি। হোসনে আরা বেগমের ঘরে চার সন্তানের প্রথম জন ছেলে রফিকুল ইসলাম। এরপর জন্মগ্রহণ করেন মনি। মনির জন্মে সবচেয়ে বেশি খুশি হন তার বাবা। বিবাহিত জীবনে দীর্ঘ চবিক্ষশ বছর পর প্রথম ছেলে সন্তান হওয়ার দু বছর পর জন্মগ্রহণ করেন আদরের সন্তান মনি। মনির অন্য এক ভাইয়ের নাম শফিকুল ইসলাম আরজু আর বোনের নাম ঐশী।

শৈশব-কৈশর, স্কুল-কলেজ মনির পুরো সময়টা কাটে শেরপুর জেলায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হন শেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ২০০৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৩.১৯ পেয়ে এসএসসি পাশ করেন। এসএসসি পাশ করার পর ভর্তি হন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে। ২০০৯ সালে কৃষি ডিপেস্নামা শেষ করে বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরপুর আরআরসি থেকে বিএজিএড কোর্সের চতুর্থ সেমিস্টারে পড়াশুনা করছেন রেহেনা আক্তার মনি।

বাবা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ২০১০ সাল থেকে পরিবার নিয়ে নিজ এলাকা টামনী গুজাদিয়ার আদি নিবাসে বসবাস শুরু করেন। শেরপুর থেকে চলে আসার পর মনি ডিপেস্নামা শেষ করার পর একরকম বেকার হয়ে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় এলাকার পোস্টমাস্টার আলামিনের কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। ছয় মাসে তিনি তিন জন ছেলে এবং দু জন মেয়েকে কম্পিউটার শেখাতে সমর্থ হয়। এখানে থাকতেই বর্তমান সহকর্মী তরুণের (তার প্রথম কম্পিউটারের ছাত্র) মাধ্যমে করিমগঞ্জের গুজাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মনিকে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র-এর (ইউআইএসসি) উদ্যোক্তা পদে কাজ করার প্রস্ত্মাব দেন। এরপর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ পদে নিয়োগ পান মনি।

ইউআইএসসি-তে কাজ শুরু করা প্রথম দিনেই হতাশ হয়ে পড়েন মনি। দিনটি ছিল ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১। জন্মনিবন্ধনের ফরম বিক্রি করে আয় করেন আট টাকা, তাও আবার বাকিতে। হতাশায় দিন কাটতে থাকে তার। প্রথমদিকে অনেকবার মনেও হয়েছে যে, এখান থেকে ভাল কোনো কিছুর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পরিষদের চেয়ারম্যানের আন্তরিকতায় এবং সহযোগিতায় ইউআইএসসি এবং তাদের নিজস্ব প্রচারণায় সেবা গ্রহীতার হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রচারেই প্রসার – এ কথাটি চিন্তা করে কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য প্রথমদিকে মাইকিং, পোস্টারিং, ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভা ও

সেমিনারে প্রচার, ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে নিজে গিয়ে আলোচনা করেন ইউআইএসসি থেকে সেবা নেওয়ার জন্য। বর্তমানে ইউআইএসসি স্বয়ং সম্পূর্ণ। ফটোকপির মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন, প্রজেক্টর, ডেক্সটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আলমিরা ও কম্পিউটার টেবিল সব কিছুই আছে। সেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, আয়ও বেড়েছে। মাসে গড়ে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার মত আয় হয়। বর্তমানে সহকর্মী উদ্যোক্তা তরুণ সিরাজী ও মনি দু জনকেই ইউনিয়নের জনগণকে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার জন্য বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রতি দিন গড়ে ৩৫ থেকে ৪০ জন মানুষ আসেন সেবা নিতে। কখনও কখনও তা ১০০ জনেও ছাড়িয়ে যায়। এখন এক বাক্যে বলা যায় – মনির আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে সেবা দানের জন্য ইউআইএসসি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মনিকে এ কাজে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা যোগান করিমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ গোলাম কবির। তিনি এই বিষয়টিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বলে উপজেলার সবগুলো ইউআইএসসির সফল কার্যক্রমের কারণে কিশোরগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। আর মনি ইতিমধ্যে অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলায়।

২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম মনিকে আমন্ত্রণ জানান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের ১৮৭১শস মাধ্যমে মনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে মনি আশার আলো দেখতে পান নিজের মধ্যে। নিজেকে আরও দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি সমাজের অবহেলিত মানুষের কিছু করার পরিকল্পনা করেন তিনি। একই বছর ভালো লাগা এবং ভালোবাসার জায়গা থেকে ৪০৩তম ব্যাচের ইয়ুথ লিডার্স ট্রেনিং, ১০২তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স, গণগবেষণা কর্মশালা এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক (ভিটিআর) হওয়ার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ তার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে। প্রশিক্ষণের পর একজন নারীনেত্রী হিসেবে তিনি এলাকার সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করছেন। পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উঠান বৈঠক, সেলাই প্রশিক্ষণ, বসত বাড়িতে সবজি চাষ প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রচারাভিযান এবং শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। এই কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে যেহেতু মানুষের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এলাকার ইতিবাচক পরিবর্তন করা যায় সেজন্য এ কাজ করতে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না রেহেনা আক্তার মনি।

ইউআইএসসি-তে কাজ করার পাশাপাশি মনি বাড়ির আশপাশের জমিতে সবজি চাষ করেন। পরিবারের চাহিদা মেটানোর পরও স্থানীয় বাজারে সবজি বিক্রি করে বছরে বাড়তি ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা আয় করেন তিনি। বাজার থেকে খুব একটা মাছ কেনা লাগে না – কারণ পুকুরে মাছ চাষ করেন মনি। পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর মাছ বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকার মত আয় করেন তিনি। সবজি বাগানের পরিচর্চা করা, পুকুরে মাছের খাবার দেয়া সকল কাজ মনি নিজ হাতে করেন। পরিবারের বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় কেনাকাটাও মনিকেই করতে হয়।

কাজ করা মনির কাছে কখনও বিরক্তিকর মনে হয় না। সেজন্য আপন মনে পরিবার এবং পরিবারের বাইরে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। মনি যে কোন সিদ্ধান্ত বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে নিতে পারেন এবং তার মূল্যায়নও হয় পরিবারের নিকট। কখনও পরিবার থেকে বাধা আসেনি কোন কাজ করার ক্ষেত্রে। কারণ সেই বিশ্বাসযোগ্যতা তার পরিবারের কাছে তিনি

তৈরি করতে পেরেছেন। তার কাছে মনে হয়, ছেলে মেয়েতে কোনো তফাৎ নেই, ভাইদের চাইতে পরিবারে তার অবদান কোনো অংশে কম নয়। সকল কাজে সে সফল হতে সমর্থ্য।

করিমগঞ্জের ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে তথা পুরো কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে গুজাদিয়া ইউনিয়নের ইউআইএসসি প্রশংশার দাবি রাখে। এটি সম্ভব হয়েছে মনি এবং তার সহকর্মীর প্রচেষ্টায়। মনি নিজ ইউনিয়নের ওয়েব পোর্টাল, উপজেলার ওয়েব পোর্টাল এবং অন্যান্য ইউনিয়নের পোর্টালের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। জনগণের অন্যায় আবদারের কারণে তিনি কয়েকবার পেশা পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলেও তিনি এখন ইউআইএসসি–কে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। প্রযুক্তির সম্ভাবনা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে করে তার স্বপ্ন দেখা বিফলে যাবে না বলে মনে করেন মনি। একটু শ্রম এবং আন্ত রিকতায় স্বপ্ন পূরণের দ্বারপ্রান্তে যাওয়া যাবে বলে মনির বিশ্বাস। ইউআইএসসি-এর সেবায় এলাকার ছেলে মেয়েদের প্রযুক্তির অন্বেষণে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ব্যাপকভাবে করার প্রয়াশ আছে মনির। যুগপোযুগী একটি সাইবার ক্যাফে করার পরিকল্পনাও রয়েছে তার, যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তিগত সেবা পাবে।

নিজের কথা বলতে এখনও বিবাহিত সংসার জীবনে প্রবেশ করেননি মনি। নিজেকে যোগ্যতার সর্বোচ্চ আসনে দেখতে চান তিনি। কারও করুণার পাত্র বা গুণগ্রাহী হয়ে থাকতে চান না। কৃষি প্রকৌশলী হিসেবে সরকারি বড় কোন চাকুরির আকাঙ্ক্ষাও আছে তার, সেই লক্ষ্যে কাজও করে যাচ্ছেন মনি। বাবা-মার দেখাশুনার পাশাপাশি ছোট বোনটিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করে যাবেন তিনি। আর যে সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাবেন আজীবন – পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত।

রেখা আক্তার: ন্যায়ের পক্ষে যার অবস্থান

শিপ্রা পাল

রেখা আক্তার। কলমাকান্দা থানার বেশিরভাগ অসহায়, নিপীড়িত ও বঞ্চিত প্রতিটি মানুষের কাছে একনামে পরিচিত। পুরো নাম রেখা আক্তার। তিনি ১৯৬৭ সালে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা সদর ইউনিয়নের চৈত্রংপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়।

এইচএসসি পাশ করার পর ১৯৭৯ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে রেখার বিয়ে হয় স্থানীয় ব্যবসায়ী শহীদ মিয়ার সাথে। শশুর বাড়িতে সুখেই দিন কাটতে থাকে রেখার। বিয়ের ১১ বছর পর ১৯৯০ সালে অসুস্থ হয়ে মারা যান রেখার স্বামী। ততদিনে তিনি চার সন্তানের মা। এ সময় তার কোলের ছোট সন্তানের বয়স মাত্র দেড় বছর। স্বামী মারা যাওয়ার পর এক বছর শশুর বাড়িতে কাটান তিনি। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন স্বপ্না। বাবার বাড়িতে কোনরকমে দিন কাটতে থাকে রেখার। তার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয় স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিপ্রা পালের সাথে। তার আমন্ত্রণে ১৯৯৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন রেখা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে রেখার মনে হয়েছে, উজ্জীবকদের উজ্জীবনার শেষ নেই। এটি জেগে থাকলে ব্যক্তি নিজেই নিজের পথ ও ভবিষ্যত গড়তে পারে। একই বছর তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে (২য় ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর তিনি উপলব্ধি করেন, আমাদের সমাজের নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। নারীরা ঘরে বাইরে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। তাই তিনি অবহেলিত ও নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা নেন।

রেখা ১৯৯৬ সালেই স্থানীয় কলমাকান্দা মহিলা অধিকার-এর সদস্য হন। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের জড়িত হয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন তিনি। চেষ্টা করেন এলাকা হতে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক নির্যাতন দূর করতে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালে রেখা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা পদে প্রার্থী হন। কিন্তু নির্বাচনী জয়ী হতে পারেননি তিনি।

নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি মনে করেন যে, এলাকাবাসী তার কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। তিনি আরও ভালোভাবে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। সবাইকে তিনি তার সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেন। ২০০৩ সালে রেখা আবারও নির্বাচনে প্রার্থী হন। এবার তিনি জনগণের ভালবাসায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বক্ষণ ভাবতেন, কীভাবে আরও ভালভাবে মানুষের সেবা করা যায়। এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও পুরুষ ইউপি সদস্যদের চাপের মুখে পরিষদের সভা না হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাদা রেজুলেশন খাতায় স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে ইউনিয়ন পরিষদের সবার শত্রুতে পরিণত হন তিনি। কিন্তুদমে যাননি রেখা। কারণ তিনি তো কোন অন্যায় করেননি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন মাত্র। তিনি সব সময় ন্যায়ের পক্ষে দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন।

রেখা ২০০৬ সালে মহিলা অধিকার থেকে রেজিস্টার করে স্থানীয় অবহেলিত ও অসহায় নারীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন, যার নাম দেন 'শাপলা ভূমিহীন সমিতি। সমিতিতে জমা করা সঞ্চয় হতে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ দেওয়া হত। এভাবে অনেক নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলেন রেখা। এরপর ২০০৭ সালে ৫০ জন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলেন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সোসাইটি। বর্তমানে কলমাকান্দা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৪শ' জন সদস্য নিয়ে এগিয়ে চলছে সংগঠনের কার্যক্রম। এ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিবন্ধীদের আবাসনসহ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

রেখা মনে করেন, শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের জন্য একটি অভিশাপ। এজন্য তার এলাকার কোন কন্যাশিশু যাতে শিশুবিবাহের শিকার না হয় সেজন্য তিনি অভিভাবকদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি শিশুবিবাহ বন্ধে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া যৌতুক ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। আর এ সবই করেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে, কোন আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করে নয়।

স্থানীয় কিছু স্বার্থান্বেষী ও প্রভাবশালী লোক তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও এলাকার কিছু সৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা করছেন প্রথম থেকেই। যে কারণে তিনি উদ্যম হারিয়ে ফেলেননি। হারিয়ে যায়নি তার সেবা করার মানসিকতা। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাছে। রেখা মনে করেন, এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না হতে পারলে তার আত্মা অতৃপ্ত থেকে যেত এবং মানুষের সেবা করার মানসিকতা তার মধ্যে জন্ম নিত না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট একজন মানুষের পরিবর্তনের জন্য। আত্মনির্ভরশীল ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তার মত মানুষদের গড়ে তুলতে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই দেশের সব প্রান্তের মানুষকেই উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা দরকার বলেও মনে করেন তিনি।

সমাজ উন্নয়নকর্মী শাহনাজ স্বপ্নার গল্প

এ.এন.এম.নাজমুল হোসাইন

শাহনাজ স্বপ্না। বাবা মোঃ শাহিদ উদ্দিন পাকিস্থানের রাওয়ালপিন্ডিতে বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকার সুবাদে সেখানেই ১৯৭৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলা সদর থানা শহর থেকে ৩২ কিলোমিটার পূর্বে এবং আটপাড়া থানা হতে চার কিলোমিটার দক্ষিণে। গ্রামের নাম গোয়াতলা বাগবাড়ী। ছয় বছর বয়সে পিতা-মাতার সাথে পাকিস্থানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে স্থায়ীভাবে চলে আসেন বাংলাদেশে।

দেশে ফিরে স্বপ্না রাজধানী ঢাকার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-এ ভর্তি হন। এ স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবুল কালাম আজাদের সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামী পেশায় ছিলেন চাকুরিজীবী। বিয়ের পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পিতা-মাতার অনেক ইচ্ছা ছিল স্বপ্না উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে আশা ফিকে হয়ে যায়। বিয়ের পরও লেখাপড়ার চেষ্টা চালিয়ে যান স্বপ্না। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। পুতুল খেলার মত সংসার করতে থাকেন এবং দু পুত্র সন্তানের মা হন তিনি।

১৯৯৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি। এ দিন স্বামীকে হারিয়ে দুঃখের অথই সাগরে পড়েন স্বপ্না। সংসারে নেমে আসে আর্থিক অনটন। কিন্তু শাহনাজ স্বপ্না দমে যাওয়ার পাত্রী নন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করার পাশাপাশি নিজের লেখাপড়ার প্রতিও দূর্বার আকর্ষণ অনুভব করেন। যেই ভাবা সেই কাজ। মা-বাবার অনুপ্রেরণায় এবং স্বামীর পরিবারের সাথে সমঝোতা করে তিনি ১৯৯৫ সালে আবারও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-এ দশম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কঠোর অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন। শাহনাজ স্বপ্না ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন, তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষের সেবা করবেন। সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এসএসসি পাশের পরও পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৯৭ সালে এইচএসসি পাশ করেন তিনি। লেখাপড়ার বিষয়ে তার বাবাই তাকে সব সময় অনুপ্রেরণা যোগাতেন।

ভালভাবেই দিন যাচ্ছিল তার, কিন্তু ১৯৯৮ সালে বিএ পড়া অবস্থায় ধরণীর মায়া ত্যাগ করে তার বাবা পরলোক গমন করেন। বাবার মৃত্যুর পর সন্তানসহ পিতার ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জায়গায় পৈত্রিক বাড়িতে চলে আসেন স্বপ্না। থেমে যায় তার লেখাপড়া। কিন্তু বসে থাকার মানুষ নন স্বপ্না। নেত্রকোনা যুব উন্নয়ন হতে টাইপ ও শর্টহ্যান্ড, সেলাই প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু এবং সবজি ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

স্বামী মারা গেলেও সন্তানদের কখনও বাবার অভাব অনুভব করতে দেননি তিনি। সব সময় বুকের মধ্যে আগলে রেখেছেন তাদের। বর্তমানে বড় মেয়ে এইচএসসি পরীক্ষা দিবে, বড় দুই ছেলে বিএ অনার্স শেষ করে একটি বেসরকারি ফার্মে চাকুরি করছে।

স্থানীয় উজ্জীবক নন্দনের কাছে প্রথম দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারেন স্বপ্না। এরপর পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নেত্রকোনা অঞ্চলের সমন্বয়কারী সুশান্ত সরকারের সাথে। ২০০৩ সালে স্বপ্না উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

করেন। এর এক বছর পর ২০০৪ সালে আটপাড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সে (৫ম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন তিনি।

প্রশিক্ষণ দুটি নেওয়ার পর তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য কিছু করার জন্য তাগিদ অনুভব করেন স্বপ্না। স্থানীয়ভাবে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের কর্মমুখী করে একটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি। স্থানীয় নারী ও পুরুষদের নিয়ে উপজেলা পশুসম্পদ-এর অধীনে হাঁস-মুরগি পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন এবং তাদেরকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের প্রায় সবাই আজ স্বাবলম্বী।

স্বপ্না বয়স্ক ও হতদরিদ্র ছেলে-মেয়েদের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজ এলাকায় শতভাগ স্বাক্ষরতা অর্জন করান। এখনও তিনি দুস্থ শিশুদের নিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজে সকলের পাশে থাকেন বলেই স্বপ্না আপা জনপ্রিয়। কারণ সকল কাজেই স্বপ্না আপাকে কাছে পাওয়া যায়।

স্বেচ্ছাব্রতী কাজের পুরস্কারস্বরূপ তিনি সরকারিভাবে ১৯৯৭ সালে শুনই ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন। তিনি উপলব্ধি করেন, নিজের আত্মোন্নোয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই নারী নির্যাতন রোধ, শিশুবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ ও বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করা সম্ভব। এমন উপলব্ধি থেকে তিনি এ পর্যন্ত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করেছেন ১৯০টি, মা সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এছাড়া ১ হাজার ২শ' জন শিশুর মেডিকেল চেকআপ করিয়েছেন, ১০টি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ১৯৫ জন নারীকে, শিশুবিবাহ বন্ধ করেছেন ৩০টি। যৌতুক, শিশুবিবাহ ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নাটিকা লেখা ও দৃশ্যায়ন করিয়েছেন স্কুলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে। এছাড়া দুটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আয়োজনে তিনি সহায়তা করেছেন।

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বপ্না আপা বলেন, আমি শুধু এখন আর একজন নারী নই, আমি একজন মানুষ। তিনি মনে করেন, নিজের বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে নিজের পরিপূরক হিসাবে তৈরি করতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভর না করে ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে সব বাধা। নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

কর্মে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ডাঃ রাবেয়া বেগম

মোঃ আসির উদ্দীন

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা একটি জনবহুল এবং সুপরিচিত স্থান। কাল্পনিক কাহিনী অনুযায়ী, পেতনিদের আধিক্যের কারণে পেতনিতলা থেকে পত্নীতলা নামের উৎপত্তি। বর্তমান পত্নীতলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের পত্নীতলা গ্রামেই ১৯৬৭ সালে আলহাজ্ব খলিলুর রহমান ও গোলেনুর বেগমের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন রাবেয়া।

নিরাপদেই কেটেছে রাবেয়ার শিশু ও বাল্যকাল। তৎকালীন সময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকরা ছিলেন উদাসীন। তাই বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি রাবেয়া। পত্নীতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পড়াবস্থায় পিতামাতার পছন্দে নিজের অজান্তেই ১৯৮০ সালে একই গ্রামের আব্দুল লতিফের সঙ্গে বিয়ে হয় রাবেয়ার।

বিয়ের পর শশুরবাড়িতে কিছুদিন ভালই কাটে রাবেয়ার। কিন্তু পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় সারাক্ষণ কাজের মধ্যে থাকতে হতো তাকে। এছাড়াও সামান্য ভুলে ভৎসনা ছিল নিত্য পাওনা। বিবাহিত জীবনে রাবেয়া দু ছেলে এবং এক মেয়ের জননী। সংসারে দুর্দশা নেমে আসে ১৯৯৫ সালে। এ সময় এক সড়ক দুর্ঘটনা রাবেয়া বেগমের স্বামীকে পঙ্গু করে ফেলে। স্বামীর অসুস্থতার কারণে সংসারে নেমে আসে অচলবস্থা। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে স্বামীর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ছয় বিঘা এবং নিজেদের ক্রয়কৃত তিন বিঘা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ২০০০ সালে রাবেয়ার স্বামী মৃত্যবরণ করেন।

স্বামীর মৃত্যুতে সংসারে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, তার ফলস্বরূপ চরম দুর্দশায় জীবন কাটাতে হয় রাবেয়াকে। জীবনের অপুরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শুরু হয় সংগ্রামী জীবন। সংসার চালাতে কী না করেছেন তিনি। কখনো কখনো সামান্য বেতনে অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজও করতে হয়েছে তাকে।

সারাক্ষণ রাবেয়ার মনে হতো– নিজেকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হতে হবে। যে ভাবা সেই কাজ। কিশোর বয়সে যা অর্জন করেতে পারেননি, তা অর্জনে আবারও শুরু করেন লেখাপড়ার পালা। নব উদ্যমে রাবেয়া চালিয়ে যান পড়ালেখার পাঠ। ২০০২ সালে পাশ করেন এসএসসি।

শশুর বাড়িতে যৌথ সংসারে থাকায় ভাসুরের সাথে রাবেয়ার অনেক বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে একদিন ভাসুর রাবেয়াকে বেদম প্রহার করে। তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সেখানেই পরিচয় ঘটে জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার নিয়তি রাণী শীলের সাথে। এই নারীই তাকে উৎসাহ যোগান প্যারামেডিক্স কোর্সে ভর্তি হতে। দু বছর খুলনার বয়রায় প্যারামেডিক্সে মেধা তালিকায় সাফল্য অর্জন করে ২০০৪ সালে আবারও গ্রামে ফিরে আসেন। কিন্তু কী করবেন – কীভাবে কাজ শুরু করবেন – এ নিয়ে দোটানায় পড়ে যান। রাবেয়ার সংগ্রামী জীবনে সবসময় সন্তানরা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে – তাই প্রাধান্য পেয়েছে। মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু জমিও বিক্রি করে দেন তিনি। তার প্রচেষ্টায় ছেলে মেয়েরা আজ প্রতিষ্ঠিত কিন্তু থেমে নেই রাবেয়ার পথচলা।

২০০৮ সালে স্থানীয় ইউপি সদস্য আতাউর রহমান রাবেয়াকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে রাবেয়া ভাবেন, কী হবে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে। কিন্তু প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া পর আত্মশক্তি বৃদ্ধির আলোচনা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর পশ্চাৎপদতাই দায়ী – এমন আলোচনা তাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যেন নতুন পথের দিশা পান। শুরু হলো নিজেকে এবং সমাজকে পাল্টাবার পালা। এলাকায় নারীদের সংগঠিত করে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়ায় কর্মশালা পরিচালনা করেন তিনি। এলাকার নারীদের সাথে এভাবে মেশার সুযোগ এর আগে কখনও হয়নি তার। তাই নারীদের বিপদে আপদে ছুটে যান সুযোগ পেলেই। এলাকার নারীরাও মনের কথা বলার জন্য একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে পান।
সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ফলে রাবেয়ার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং নিজের অসহায়ত্ব অজান্তেই দূরীভূত হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। শুরু হয় নতুন পথচলা।

২০০৪ সালে মেধায় প্রথম স্থান অধিকার করায় প্যারামেডিক্স কলেজ হতে ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে কিছু যন্ত্রপাতি এবং আলমারী পান। এবার বাড়ি হতে টিন নিয়ে এসে নিজেদের একটি দোকানে বসেন। নজিপুরে মেছের হোমিও হলের অধিকর্তা শরিফুল ইসলাম তাকে বাকিতে ৫শ' টাকার ঔষধ দেন। তা দিয়েই শুরু হয় তার চিকিৎসা পেশা।

প্রথমদিকে রোগীর সংখ্যা কম থাকলেও আজ আর সে অবস্থা নেই। মেয়ে মানুষ আবার ডাক্তারী করবে এমন কত ভৎসনাই না সইতে হয়েছে তাকে। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাসী রাবেয়া সমালোচনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে শুরু করেন। পত্নীতলা বাজারে ডাঃ রাবেয়া বেগমের আজকের অবস্থান তাকে সামাজিকভাবে এতটাই সুদৃঢ় করেছে যে, না দেখলে ভাবাই যায় না। আজ আর দৈন্যতা নেই। আজ শুধুই সাফল্যে ভরপুর ডাঃ রাবেয়ার জীবন। যে জীবনে একটি টাকাও ছিল না এখন প্রতিমাসে রোগী দেখা, ঘরভাড়া এবং অন্যান্য উৎস হতে ২৩ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা আয় হয় তার।

আজ পত্নীতলার কারো সন্তান অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে প্রথমেই ছুটে আসেন ডাঃ রাবেয়া বেগমের কাছে। অনেক পরিবারের কাছে রাবেয়া এখন শুধু একটি নাম নয়, অনুকরণীয় আদর্শের নাম।

স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজের প্রভাবশালীরা যখন তাকে সহযোগিতা না করে সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং একগুচ্ছ তাচ্ছিল্য দিয়েছিল তাকে, সে সমাজ আজ ডাঃ রাবেয়া বেগমকে দিয়েছে সম্মানের আসন। অবশ্য সেজন্য প্রায় এক দশক সমাজের সকল বাস্তবতাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়েছে রাবেয়াকে।

২০১০ সালে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের অদৃশ্য ইশারায় তার দোকান ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। সাময়িক বিপদ সামাল দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের বোঝা না হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে সমাজে নিজ অবস্থান শক্ত করেছেন তিনি। নিজে ব্যবসা করে চলেছেন এবং পত্নীতলা বাজারের অন্য দশ জন ব্যবসায়ীকে সুষ্ঠভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

২০০৪ সালে শুরু করে প্রায় নয় বছর চিকিৎসা পেশায় অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। শুধু হোমিও নয়, এলোপ্যাথিক চিকিৎসাও করে চলেছেন ডাঃ রাবেয়া। দিন কিংবা রাত সবসময়ই রোগী আসে তার কাছে। কাউকে কখনও ফিরিয়ে দেন না তিনি। অভাবী, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী এবং আদিবাসীরা স্বল্পমূল্যে এবং কখনও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে তার কাছ থেকে। ডাঃ রাবেয়া দুঃস্থ ছিলেন বলে বোঝেন, একজন মানুষের দুরবস্থায় তাকে কীভাবে সহায়তা করতে হয়।

ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাবেয়া। এখন আর পেছনে ফেরার অবস্থা নেই। এখন শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। তিনি একদিকে নিজেকে সমাজের জন্য উজাড় করে দিতে বদ্ধপরিকর। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা

সবসময় তাকে তাড়া করে ফেরে। নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আমাদের বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিবার ও সমাজে নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাত এ নির্যাতনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে কয়েক গুণ। তাই আমাদের সমাজের নারীরা যদি ডাঃ রাবেয়ার মতো নব-উদ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠায় আবারও বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী হিসেবে প্রত্যেক ঘরে জন্ম নিবে একেক জন সফল আদর্শ নারী। ডাঃ রাবেয়ার সংগ্রামী জীবন সে ধরনের সফল নারী তৈরিতে হতে পারে এক অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ।

নিলুফা জহুর লিলি: এক আত্মপ্রত্যয়ী জনপ্রতিনিধি

সুব্রত কুমার পাল

শ্যামলা বর্ণের ছোট ফুটফুটে মেয়েটি ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন জয়পুরহাট শহরের বিশ্বাসপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ই মেয়ের মুখ দেখেই বাবা আক্কাস আলী শেখ বলেছিলেন, 'তোমরা দেখ এই মেয়ে অনেক বড় হবে'। ছোট্ট মেয়েটি ঘুরতে-ফিরতে, আধো-আধো বোলো, নানা জিজ্ঞাসার ডালি সাজিয়ে যখন-তখন সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো তখন থেকেই সবাই বুঝে নিয়েছিল মেয়ে হবে একজন! এ মেয়ের তেজ হবে দেখার মত। জীবন চলার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। জীবনের চাকা যতদূর যাবে, ততদূরই জীবনের জন্য জীবনকে চলতে দেবে।

ধীরে ধীরে মেয়েটি শৈশবের শিশুমতির বোল ছেড়ে নানান কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে সব জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে – বিদ্রোহী কবির কবিতার জোরালো শ্রুতিমধুর প্রশ্ন ছুঁড়ে অজানাকে জানার বাসনায় 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে', 'দেখবো এবার জগৎটাকে' আউড়ে প্রথম পাঠের স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখে। তার মরহুম পিতার কর্মস্থল নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লি. স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে এ গণ্ডি পাড়ি দেন।

এই শৈশব-কৈশোর জীবনে তার পিতা তাকে তুলে দেন আর এক অজানা পাঠে। রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় ছোট্ট এই মেয়েটিকে। মেয়েটি সবেমাত্র মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা দিয়েছে। কৈশোরের নানান জল্পনা কল্পনায়-ভাবনায় উদীপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত মেয়েটি। পরিবর্তনের রঙধনু যখন তার দেহ-মনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে উপযুক্ত করেছে, হাতে-খড়ি মাখছে, ঠিক তখনই তার বাবা রাজশাহী জেলা চারঘাট উপজেলার প্রকৌশলী ছেলে জহুরুল হককে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শ্যামলা মেয়েটিকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে শিশুবিবাহে আবদ্ধ করেন।

যে মেয়েটি স্কুল জীবনে কি খেলাধুলা, কি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড – সবক্ষেত্রেই ছিল এগিয়ে। দলনেত্রীর মুকুটই যখন তার একার, তখনই এর বড় পরিধির স্বাদ নিতে না দিয়ে ভিন গ্রহের বাসিন্দা করে তাকে দাম্পত্য জগতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আগেই বলেছিলাম, মেয়ের তেজ আছে। বিয়ের পর মেয়েটি ভেঙে পড়েনি। শত বাধা সামনে এলেও কোন বাধাই বাধা হয়ে থাকেনি তার সামনে। মনের শক্তিই তাকে নিয়ে গেছে আজকের এই শক্ত অবস্থানে।

মা-বাবার নয় সন্তানের বড় আদরের এই তৃতীয় সন্তান লিলি। পুরো নাম নিলুফা জহুর লিলি। স্বামী সেবার পাশাপাশি এমনতরো জীবনও পরিপূর্ণ করা যায় – এমন ইচ্ছাশক্তি নিজের মধ্যে অনুপ্রাণিত করে নিজেকে মনোবলের তুঙ্গে নিয়ে যান। নিজেকে নানামুখি গঠনমূলক কর্মসাধনায় লিপ্ত করেন। হয়ে ওঠেন সংগ্রামে আবির্ভূত। এমন ক্ষণে তাদের দু জনার মাঝে কোলজুড়ে আসে প্রথম কন্যা সন্তান। এরই মধ্যে আবার স্বামীর ডাক পড়ে বিদেশে। স্বামীও বৃত্তি নিয়ে চলে যান সেই দূরদেশে। নিঃসঙ্গতাকে ম্লান করে জীবনকে ভরিয়ে তুলতে অগ্রসর হন।

নারী বলে এমন ক্ষণে আমি পিছাবো? কখনই নয়। মেয়েরা সব পারে। এমন উপলব্ধি আর দৃঢ় প্রত্যয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন লিলি। শিশু কন্যাটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার পাঠে যেমন তিনি পারদর্শী, তেমনি পারদর্শী নারীদের উন্নয়ন ও কল্যাণে অবদান রাখতে। জন মানুষের কল্যাণকামী বহুমুখী সমাজ কর্মেও জড়িত হন তিনি।

এত কাজের পরও নিশ্চুপ নন মেয়েটি। ক্লান্তি-শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে নিষ্ঠাপূর্ণ অধ্যয়নে জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ থেকে সেই ১৯৮৫ সালে কৃতিত্বের সাথে অর্জন করেন এইচএসসি সনদ। একইভাবে লিলির জীবন স্যুটকেসে বিএ পাশের সনদও জমা পড়ে।

বড় মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস জেমিকে যখন মেধাপূর্ণ ফলাফলে স্কুল গণ্ডি পার করার পাঠশালায় পাণ্ডিত্য রাখছেন, ঠিক তখনই ১৯৯২ সালে আবারও তার কোলজুড়ে আসে দ্বিতীয় কন্যা সন্তান ফাতেমা তুজ জোহরা জেরিন। বড় মেয়ের সাথে ছোট্ট মনিকেও যেমন আদরে-সোহাগে গড়েছে, তেমনি স্বামীর মনও ভরিয়ে রেখেছে লিলি। তারপর আবার রাজনীতি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বহুমাত্রিক সমাজকর্ম ও উন্নয়নে থাকছেন জড়িত।

এভাবে জীবনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে ১২ বছর পর বড় মাপের সমাজকর্মের সুতীব্র বাসনায় জনপ্রতিনিধিত্ব করার চেতনায় ১৯৯৭ সালে জয়পুরহাট পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনে কমিশার পদে প্রার্থী হন তিনি। জনগণ তাকে বিমুখ করেনি। তার নিরলস সমাজকর্মের স্বীকৃতিতে বিপুল ভোটে জয়লাভের বরণমালা জনগণ তাকে পরিয়ে দেয়। এবার লিলি বড় পরিসরে এলাকার নারী ও পুরুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, পূর্ণবাসন ও পরিবেশসহ বহুমাত্রার উন্নয়ন কর্মে নিজেকে জড়ায়।

২০০১ সালে ১৩ ডিসেম্বরে নিলুফা জহুর লিলির জীবনের একটি বিভীষিকাময় দিন। অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করে নেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে তিনি নিরূপায় হয়ে যান। যে স্বামী তাকে দিয়েছিল অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ, সেই স্বামী যখন এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান, তখন কোন শান্তনাই যেন আর ধোপে টেকে না।

২০০২ সালের ৩ জুন পিতা এবং ২০০৩ সালে ৩ এপ্রিল মাতাকে হারান তিনি। এরকম সংকটের মুহুর্তেও লিলি ভেঙে পড়েননি। ২০০৩ সালে পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচনে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জয়পুরহাট জেলার নারী সমাজের শীর্ষে উঠে আসেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করার সুবাদে লিলির কাছে বারংবার আসতে থাকে বিজয়ের বরণডালা।

কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে নিলুফা জহুর লিলি যেন তার স্বপ্ন ছোঁয়ার জায়গাটি তখনও ধরতে পারেন না। এ সময়ই সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র মণ্ডলের কাছে জানতে পারেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও এর কার্যক্রমের কথা। ২০০৫ সালে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর জয়পুরহাট জেলা শাখা কমিটি গঠনের সময় পরিচয় হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উপ-পরিচালক নাছিমা আক্তার জলির সঙ্গে। নাছিমা আক্তার জলির বক্তব্যে উদ্দীপনা জাগে নিলুফা জহুর লিলির মনে। তার মনের সুপ্ত শক্তি যেন জেগে ওঠে। এভাবেই যুক্ত হন হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে। পরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্সের ২য় ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পারেন বর্তমান সমাজে নারীর বাস্তব চিত্র। নারীর এই অবহেলিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে মনে মনে পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। তিনি অনুধাবন করেন, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নারী উন্নয়নে কাজ করলেও তা ছিল অপরিকল্পিত। যে কারণে সে কাজগুলো থেকে খুব একটা ফলাফল অর্জিত হয়নি।

২০১০ সালের ১৯-২২ জানুয়ারি সদর উপজেলার মোহাম্মদাবাদ ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত চার দিনব্যাপী ১৫৯৭তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নিলুফা জহুর লিলি। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পেয়ে যান আরেক নতুন দিগন্ত। নিজেকে আরও বেশি পরিমাণে জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার কৌশল রপ্ত করেন। কারণ তার নেই কোনো পিছুটান। তার মনের সুপ্ত স্বপ্নগুলো আরও মেলে ধরার সুযোগ তৈরি করে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। লিলি শুধু নিজেই যে নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কিংবা উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তা কিন্তু নয়, তার দুই মেয়েকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে উৎসাহ যোগান।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিয়সী নারী ও পুরুষের সান্নিধ্যে থেকে লিলি পেয়েছেন উদ্যম, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। এদের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে লিলি সার্থকতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এমন সব নেতৃত্বের গুণাবলী। নিলুফা জহুর লিলি একদিকে মা, অন্যদিকে একজন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি। তিনি যখন বিএ ক্লাসের শিক্ষার্থী – সে সময় এলাকাবাসী তার কর্ম উদ্দীপনা, মনোবল আর আত্মবিশ্বাস দেখে পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বী হওয়ার আহক্ষান জানায়। জনগণের অনুপ্রেরণায় নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জয়পুরহাট পৌরসভায় সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। প্যানেল মেয়রও হন প্রথম দফাতেই। জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়।

এ গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সংগ্রামী নারী লিলি ভাগ্যহীন, অসহায়, স্বামী পরিত্যক্তা, যৌতুকের শিকার ও অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের বিনা পয়সায় আইনি সহায়তাও প্রদান করেন। শিশুবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, সেই সাথে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পৌরসভার পাশাপাশি এলাকার উদ্যমী তরুণ-তরুণীদের নিয়ে আশেপাশের ইউনিয়নের গ্রামগুলোতেও শুরু করেন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি।

দীর্ঘ কর্মজীবনে নিলুফা জহুর লিলি সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহিলা কমিশনার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক জয়পুরহাট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম জেলা শাখার আহক্ষায়ক, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক জেলা শাখা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জেলা রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, জেলা ডায়াবেটিক হাসপাতালের আজীবন সদস্য, জয়পুরহাট লাইব্রেরী এন্ড ক্লাবের নির্বাচিত সহ-সভাপতি, নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (নউক) জেলা শাখার সদস্য, জয়পুরহাট পৌরসভার হেলথ কনভেনর, জয়পুরহাট পৌরসভার জেন্ডার ও পরিবেশ উপ-কমিটির চেয়ারপার্সন, জয়পুরহাট জেলা ভাওয়াইয়া একাডেমীর সহ-সভাপতি, মা, শিশু ও নারী কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, বিশ্বাসপাড়া মহিলা সমবায় সমিতির নির্বাহী পরিচালক, কমিউনিটি পুলিশিং জেলা কমিটির সদস্য এবং জয়পুরহাট কাশিয়াবাড়ী শহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ জয়পুরহাট জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১০-এ জেলার একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ী নারী হিসেবে নিলুফা জহুর লিলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তার হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক।

নিলুফা জহুর লিলি শ্রম, সাধনা আর আত্মবিশ্বাসের ফলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে আজকের এ পর্যায়ে এসেছেন। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্স ও উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হিসেবে গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোকিত পথের সহজ সন্ধান পেয়েছেন। নারীকে পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে আনতে এ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি মনে করেন। তিনি পৌরসভা বা কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়েই নিজের শক্তি আর সামর্থ্য দিয়েই অনগ্রসর নারীদের এগিয়ে নিতে চান, অবহেলিত নারীদের পাশে থেকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনে শক্তি যোগাতে চান। সেই সাথে আগামীর শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি তার স্বপ্নপূরণে সফল হবেন বলেই তার বিশ্বাস।

ফাজিলপুরের শিরিন: অদম্য এক সমাজকর্মীর নাম

মোঃ খোরশেদ আলম ও জাকারুল ইসলাম

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার ফাজিলপুর গ্রাম। উন্নয়নের সামান্য ছোঁয়া লাগলেও গ্রামে নেই লেখাপড়ার ভাল কোন পরিবেশ। বেশিরভাগ মানুষ বাস করেন দারিদ্র্যসীমার নিচে। বিদুৎ সংযোগ না থাকায় সন্ধা নামার সাথে সাথে অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা গ্রাম। এরকম এক অজোপাড়া গাঁয়ে ১৯৮৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক রকম সহায় সম্বলহীন পরিবারে জন্ম নেন শিরিন।

বাবা মোঃ আঃ মান্নান, মাতা নছিরন বিবি। তাদের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সংসারের অভাব অনটনের কারণে যথাসময়ে মেয়ের লেখা পড়া শুরু করাতে পারেননি। কিন্তু প্রতিভা আর অটুট ইচ্ছাশক্তির কারণে নয় বছর বয়সে তিনি শিরিন ভর্তি হন ফাজিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ সময় তাকে লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারের অন্যসব কাজ করতে হত। চরম খাটুনি আর একরকম না খেয়েই পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন শিরিন। এরপর টাকার অভাবে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু প্রাথমিকে ভাল ফলাফল করায় বাবা মা অতি কষ্টে তাকে জাহাঙ্গীরপুর আলিম মাদ্রাসায় ভর্তি করান। ২০০৩ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করেন শিরিন। দাখিলেও ভাল ফলাফল করার পর তিনি ধামুরহাট উপজেলার ধামুরহাট টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ২০০৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করেন। শিরিন এরপর পত্নীতলা উপজেলার শিবপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০০৯ সালে বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

ছোটবেলা থেকে নারীর ওপর নির্যাতন ও বৈষম্য পর্যবেক্ষণ করে শিরিন অবহেলিত ও নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীর তালিকায় নিজের নাম লিখাতে চাননি। এজন্য তিনি শিক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে যান। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনি করে অর্থ উপার্জন করতেন। এছাড়াও সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে পোশাক বানানোর কাজ, সৌদি টুপি বানানো, ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষকতা করা – সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে চার হাজার টাকা মাসিক আয় করতেন। ছয় ভাই বোনের সংসারে (তিন ভাই ও তিন বোন) পঞ্চম জন শিরিনকে উপার্জিত এই আয় থেকে দরিদ্র পিতার সংসারে সহায়তা করতে হতো। আর বাকী টাকা দিয়েই চালিয়ে নিতেন নিজের লেখাপড়ার খরচ।

পড়াশুনা করতে মহাদেবপুর থেকে যেতে হয়েছে পাশের উপজেলা পত্নীতলা ও ধামুরহাটে। একজন নারী হিসেবে বাড়ির বহিরে যাওয়াতে মা-বাবা কখনও শিরিনের ওপর বাধা আরোপ করেননি। কারণ শিরিন সদা দায়িত্বশীল ও সঠিকভাবে পথ চলতে শিখেছে সেই ছোটবেলা থেকেই। তার এই পথচলা মা-বাবার মনেও বিশ্বাস জন্ম দিয়েছে, জাগিয়েছে আশার আলো। শিরিন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। শিরিনের এই পথ চলা ও আস্থাপূর্ণ জীবন পরিবার ছাড়িয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত এই জনপদকে যেন দেখিয়েছে আলোর ছটা ও অনন্য দৃষ্টান্ত। পড়াশুনা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চলতে চলতেই ২০০৮ সালে কুষ্টিয়া জেলা খোকসা উপজেলার পদ্মবিল গ্রামের দুবাই প্রবাসী ইদ্রিস হাসানের সাথে টেলিফোনে বিয়ে হয়। বিয়ের পর শিরিন শশুরবাড়ি চলে যান এবং সেখান থেকেই ডিগ্রি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। সাংসারিক নানা ঝামেলার মাঝেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বার বার পরীক্ষায় সফলতা পাওয়া শিরিন এবার বিএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

শশুরবাড়ি, সংসার আর ঘরে আবদ্ধ থাকা শিরিনের আর বিএ পাশ করা হয়নি। তাই বলে তিনি জীবন সংগ্রামের লড়াই থামাননি একটিবারের জন্যেও। স্বামী প্রবাসী, তাই শশুরবাড়িতে থাকা শিরিনের বেশিদিন ভাল লাগেনি। কারণ ছোটবেলা থেকে সংগ্রাম করা, আয় উপার্জনমূলক কাজ কর্মে জড়িত থাকা, সমাজের অবহেলিত নারীদের সাথে কাজ করা কর্মচঞ্চল শিরিনের মন অস্থির থাকে সব সময়। প্রবাসীকে বিয়ে করার পর আর্থিক দৈন্যতা না থাকলেও কর্মে অভ্যস্ত জীবন তাকে প্রতিনিয়ত আহক্ষান করে কাজে ফিরে যেতে। তাই আর কাল বিলম্ব না করে তিনি ফিরে আসেন বাবার বাড়ি মহাদেবপুর

উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামে। ফিরে এসেই শিরিন ব্র্যাকের ওয়াশ প্রোগ্রামে মাঠকর্মী হিসেবে চাকুরি করার সুযোগ পান। বিয়ের পর আর্থিক টানাটানি না থাকলেও আত্মনির্ভশীল জীবনই তার পছন্দ।

এ সময় ছোটবেলা থেকে সঞ্চিত নারী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা শিরিনকে বারবার পীড়া দিতে থাকে। কারণ শিরিন অনেক কন্যাশিশুকে শিশুবিবাহের শিকার হতে দেখেছেন, বিদ্যালয় ছেড়ে অল্প বয়সে সংসারের ঘানি টানতে দেখেছেন। শুধু নারী হওয়ার কারণে অনেক নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখেছেন। অনেক সময় প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু কোন ফল বয়ে আসেনি। কারণ তিনি যে একা। কি করা যায়, কীভাবে গ্রামের অবহেলিত নারীদের তার নিজের সারিতে নিয়ে আসা যায়, কীভাবে তাদের আত্মনির্ভশীল নারী হিসাবে গড়ে তোলা যায়?

এমন চিন্তা ও নিত্য ব্যস্ৰ জীবনের মধ্য দিয়ে চলছিল তার জীবন। এরকম এক সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মহাদেবপুরের নারীনেত্রী রওশন আরার আমন্ত্রণে ২০১১ সালে ১৬০৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শিরিন। ২০১২ সালে একই সংস্থার আয়োজনে ৯৮তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্স ও ৭ম ব্যাচে গণগবেষণা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।

প্রশিক্ষণগুলো চলাকালীন সময়ে তিনি কতগুলো উন্নয়ন ভাবনা ভাবতে থাকেন। প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর শিরিন দরিদ্র, অবহেলিত নারীদের জন্য কিছু করার সুযোগ পেয়ে যায়। ইউনিয়নের ১৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীনেত্রী ও উজ্জীবকদের নিয়ে তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কমিটি গঠন করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর মহাদেবপুর উপজেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। যেখানেই শিশুবিবাহ, নারী নির্যাতন – সেখানেই শিরিনের নেতৃত্বে একদল নারী প্রতিবাদমূখর হয়ে হাজির। আর আজ শিরিন একা নন। তার সাথে আছেন একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীনেত্রী, উজ্জীবক ও গনগবেষক। এসব কাজের জন্য এলাকায় শিরিন ইউনিয়নের সবার কাছে নারীনেত্রী শিরিন নামেই পরিচিত।

যেমন পরিচিতি তেমন কাজ। তাই শিরিন নিজের জীবনের স্বপ্নপুরণ আর অন্য নারীদের নিয়ে উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা আঁকতে থাকেন। তার সাথে যুক্ত হয় আনোয়ারা, রওশন, ছবি, মোতাহিরা-সহ আরও কিছু উদ্যোগী নারীনেত্রী। শিরিন ইতিমধ্যে গ্রামের ৩০ জন নারী-পুরুষ নিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছেন গণগবেষণা সমবায় সমিতি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারি সহযোগিতায় এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ-এর নানাবিধ পরামর্শে সংগঠনের পরিধি বাড়তে থাকে। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার টাকা। এ টাকা হতে দরিদ্র সদস্যদের কুটির শিল্পের উপকরণ ক্রয় করার জন্য বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া সংগঠনের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশুদের টিকা প্রদান নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধীদের টিকাদান-সহ নানা সহায়তা দেওয়া হয়।

শিরিন গ্রামের অবহেলিত নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্যাগ ও টুপি তৈরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছেন। ইতিমধ্যে ১০ জন নারী সেলাই মেশিন ক্রয় করে প্রতি মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আয় করছে। ৩০ জন নারীকে গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় এলাকার ৬শ' পরিবারকে স্যানিটারী ল্যাট্রিন প্রদান করেছেন শিরিন। এ পর্যন্ত তিনি ৩০টিরও বেশি উঠান বৈঠক পরিচালনা করে প্রায় ৩৫০ জন নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন। নিজ গ্রামে গণগবেষণা সংগঠনের মাধ্যমে দু'টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন। এই শিক্ষা কেন্দ্রে ২৫ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এছাড়া তার উদ্যোগে ২০১৩ সালে ফাজিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‌্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এছাড়া শিরিনের উদ্যোগে নারী দিবসসহ অন্যান্য দিবসগুলো উদ্‌যাপন করা হয়।

শিরিনের সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ড দেখে গ্রামের লোকেরা খুবই মুগ্ধ। নারী হয়ে শিরিন ও তার সঙ্গীরা আজ যা করছে অনেক পুরুষও তা করতে পারে নাই। শিরিনের কাজের প্রশংসা করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের এক সদস্য বলেন, শিরিন একজন নারী হিসেবে চাকরির পাশাপাশি যে কাজগুলো করছে তা অনেকের জন্যই অনুকরণীয়। শিরিনকে কাজ করতে

কোন সামাজিক ও পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। বরং সবাই তার কাজে সহায়তা করতে চায়। অদম্য সাহস আর আত্মবিশ্বাস শিরিনের পথ চলার শক্তি। শিরিন জানান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর উজ্জীবক, নারীনেত্রী ও গণগবেষণা সহায়ক প্রশিক্ষণই তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে। তার স্বপ্ন, গ্রামের প্রতিটি নারীকে আয়মুখী কাজের সাথে যুক্ত করে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সমাজ থেকে নারী নির্যাতন ও শিশুবিবাহ শতভাগ নির্মূল করে নারীর জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা।

মিনা খাতুন: চরাঞ্চলের সফল এক নারীনেত্রী

চন্দ্র শেখর

রংপুর জেলাধীন গঙ্গাচড়া উপজেলা হতে ১৫ কিলোমিটার দূরে নোহালী ইউনিয়ন। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ ইউনিয়নের চর বাগডহড়া গ্রামে। তিস্তা নদীর ভাঙা-গড়ার বৈরী খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে হোচট খেয়ে পড়েছে এখানকার মানুষের জীবন। তিস্তার পাড়ে বালুচরে চর বাগডহড়া গ্রামে বাস করে সুবিধা বঞ্চিত এক জনগোষ্ঠী। যেখানে লেখাপড়ার জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই কোন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান যেখানে অবহেলিত, ঠিক সেইখানে যিনি নিজে স্বাবলম্বী হয়ে স্থানীয় নারীদেরও স্বাবলম্বী ও অধিকার সচেতন করে তুলছেন, দূর করছেন নানা সামাজিক কুসংস্কার – জীবন সংগ্রাম সফল এ সাহসী যোদ্ধার নাম মিনা খাতুন।

২৩ জানুয়ারী ১৯৮০ সালে নোহালীর পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন আলমবিদিতরে জন্মগ্রহণ করেন মিনা খাতুন। বাবা ক্ষুদ্র কৃষক। দু ভাই ও চার বোনের মধ্যে মিনা প্রথম সন্তান। স্থানীয় আলমবিদিতর উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ১৯৯৪ সালে মোঃ আব্দুল্লাহর সাথে বিয়ে হয় তার। শশুর বাড়ির লোকজন তার সাথে ভালো আচরণ করলেও তখন পর্যন্ত সংসার সম্পর্কে তেমন একটা বুঝতে শেখেননি মিনা। কিন্তু তিস্তা নদীর ভাঙনে কয়েকবার তাদের বসতবাড়ি ভেঙে যায়, সংসারে নেমে আসে দারুণ বিপর্যয়। নতুন করে বাঁধতে হয় পৃথক সংসার। স্বামী আব্দুল্লাহ বেকার। দু বেলা দু মুঠো ভাতের জন্য স্বামীর সংসার চালানোর বিষয়টা বড় ভাবিয়ে তোলে তাকে।

ভাবনার জগতে ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে একটি চায়ের দোকান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মিনা। চর এলাকায় কোন চায়ের দোকান না থাকায় ভালই চলতো সেই মিনার চায়ের দোকান। এর পাশাপাশি স্বামী আব্দুল্লাহ চরের পতিত খাস জমি চাষাবাদ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর সর্বগ্রাসী তিস্তা নদী আবারও ভেঙে নিয়ে যায় মিনার সেই দোকানের জায়গাটুকু। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তিনি। শুরুতেই থমকে দাঁড়ায় সুখের স্বপ্ন দেখা এক নারীর জীবন। কিন্তু মিনা হতাশ হননি। বাড়ির সাথে একটা ছোট টিনের চালায় আবারও চায়ের দোকান চালু করেন। দোকান চালানোর জন্য স্বামীর হাতে এক হাজার টাকা তুলে দিয়ে একটা ছোট নলকূপ ও দোকানের মালামাল কিনে আনেন।

আবার শুরু হয় মিনার জীবনের পথচলা। এলাকার লোকজন চা পানের জন্য তার দোকানে আসতে লাগল। এলাকার আরও কিছু উদ্যোগী লোক অন্যান্য দোকান চালু করতে থাকে মিনার বাড়ির পাশে। সেখানে দোকান ঘর বসানোর জন্য জায়গার সংকট হওয়ায় মিনা নিজের পোষা গরু বিক্রির টাকায় জমি ক্রয় করে দোকান স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন। চর বাগডহড়ায় এভাবে গড়ে ওঠে একটি ছোট বাজার। বর্তমানে সেই বাজারটি 'মিনার বাজার' নামে ইউনিয়নের সবার কাছে পরিচিত। চরের লোকজনকে এখন নৌকায় নদী পাড় হয়ে বাজার খরচ আনতে হয় না। মিনার বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

মিনার এক ছেলে ও দু মেয়েসহ পাঁচ সদস্যের পরিবার। চরে কোন মাধ্যমিক স্কুল না থাকায় দু ছেলে-মেয়েকে পঞ্চম শ্রেণির বেশি পড়ানোর সুযোগ হয়নি তাঁর। ছোট মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। তাঁর স্বামী আর বড় ছেলে দোকানে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করে। মিনা নিজে প্রায় প্রতিদিনই দোকানে বসেন। দোকানে প্রতিদিন আনুমানিক তিন হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় হয়। এই আয় দিয়ে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে।

চরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় অধিকাংশ কন্যাশিশু শিশুবিবাহের শিকার হয়। মিনা অনেক চেষ্টা করেও একা এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারছিলেন না। তিনি তার নিজের জীবনের শিশুবিবাহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে বুঝতে পারেন– শিশুবিবাহ চরাঞ্চলের একটি মারাত্মক সমস্যা। মিনা তাঁর দোকানে বসে শিশুবিবাহ ও নারীদের অধিকার নিয়ে লোকজনের সাথে আলোচনা করতেন। এলাকার লোকজন বুঝতে পারে যে– তার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে।

২০১১ সালে তার পরিবার ও এলাকার লোকজন ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হতে মিনাকে উৎসাহ যোগায়। তাদের সমর্থন ও ভালবাসায় তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন তা ছিল তার একেবারে অজানা। নির্বাচনে কিছুদিন পর (২০১১ সালে) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে ৭৯তম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা তার খুব ভাল লাগে। প্রশিক্ষণ শেষে একজন নারীনেত্রী হিসেবে এলাকায় নেতৃত্ব দিতে পারবেন বলে তার আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে মিনা স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে যৌতুক ও শিশুবিবাহের কুফল, জন্মনিবন্ধন ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব এবং পারিবারিক নির্যাতন ও প্রতিরোধ বিষয়ে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। ২০১৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়ে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৮১৮তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন তিনি। এই প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে তিনি একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। নাগরিকত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার বিষয়ক আলোচনা তার মানসিকতাকে আন্দোলিত করে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তাকে সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি চরের অবহেলিত নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। অবশেষে তার এলাকায় একটি নারী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংগঠন করার জন্য এলাকার নারীদের সাথে তিনি যোগাযোগ করতে থাকেন। সংগঠন গড়ার অব্যাহত চেষ্টায় তার নেতৃত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর দায়িত্বরত ইউনিয়ন সমন্বয়কারী চন্দ্র শেখরের সহযোগিতায় গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে একটি নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। দু শ' জন নারী সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা এ সংগঠনের নাম 'মিনার বাজার নারী গণগবেষণা সমিতি'। মিনা খাতুন এই সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে ৩০ টাকা নিয়মিত সঞ্চয় হিসেবে সমিতিতে জমা দেন। এ পর্যন্ত সমিতির মোট সঞ্চয় ৫৩ হাজার ৫ শ' টাকা। সমিতির সদস্যগণকে এখন আর কোন এনজিও হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। কারণ সঞ্চয় হতে প্রতি সপ্তাহে কম সুদে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ দেওয়া হয়। সমিতির ঋণ কার্যক্রম হতে প্রতিমাসে ৫ হাজার ৩শ' ২৫ টাকা আয় হয়।

মিনার উদ্যোগে প্রতিমাসেই সমিতির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজসহ নানা সামাজিক কুসংস্কার দূর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন মিনা। গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে মিনা খাতুন ও তার সংগঠনের কয়েকজন সদস্য মিলে চর বাগডহড়া গ্রামের মোছাঃ আদরী বেগমের শিশুবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন। আদুরীর বাবা মোঃ হাবিবুর রহমান ও মাতা মোছাঃ রুজিফা বেগম তাদের ভুল বুঝতে পারেন যে, মা-বাবা হয়েও তারা মেয়ের কত বড় ক্ষতিসাধন করতে যাচ্ছিলেন। মিনার প্রচেষ্টায় শিশু আদুরীকে জীবন ঝুঁকির বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়নি। মিষ্টি আদুরী এখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে।

মিনা এখন অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি নিজেকে সমাজ পরিবর্তনের কারিগর বলে মনে করেন। নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডসভায় উপস্থিত থাকেন এবং সভায় নারীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সকল সভায় উপস্থিত থাকেন এবং তার মতামত দেন। উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে এলাকার সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলেন মিনা। এক্ষেত্রে তার মধ্যে কোন জড়তা কাজ করে না।

এভাবে মিনা দিনের পর দিন চরাঞ্চলের অবহেলিত নারী পুরুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করেই চলেছেন। সংগঠনের সদস্যগণের প্রায় সকলেই তার পরামর্শ মেনে ও সহায়তা নিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। সদস্যগণের যে কোনো সমস্যার কথা জানতে পারলে মিনা তা আন্তরিকতার সাথে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সমিতির সদস্যগণকে নিয়ে তিনি একটি সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেন। সংগঠনের সদস্যগণের মধ্যে ২৭ জন নারী লেখাপড়া জানেন না। তাই মিনা তাদের জন্য একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সমিতির মাধ্যমে মাছ চাষ, গবাদি পশু পালন ও হাস-মুরগি পালনের উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন তিনি।

মিনা খাতুন তার নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলা গণগবেষণা সমিতির মাধ্যমে অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার কাজকে চলমান রাখতে চান। তিনি এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে নারীরা নির্যাতনের শিকার হবে না, থাকবে না শিশুবিবাহ, নারীরা উপার্জন করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং সকল শিশু পাবে শিক্ষা লাভের সুযোগ। সর্বোপরি সকল মানুষ থাকবে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’।

শিক্ষার আলো ছড়াতে চান সফুরা রেজা চৌধুরী

শামীমা রহমান

১৯৫৯ সালের ১১ মার্চ, রংপুর জেলা শহরের নিউ জুম্মাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন সফুরা রেজা চৌধুরী। বাবা মোহাম্মদ সামসুদ্দিন এবং মা হামিদা বেগম। মাত্র এক বছর বয়সেই মাকে হারান সফুরা। ফলে মায়ের আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন তিনি। একই উঠানে বসত-বাড়ি হওয়ার সুবাধে দাদী ও চাচীর সাথেই থাকতেন সফুরা। সফুরার বয়স যখন তিন বছর, তখন তার বাবা আবারও বিয়ে করেন। নতুন মা তাকে খুব একটা পছন্দ করতো না এবং সবসময় এড়িয়ে চলতো। নতুন মার সাথে ভালো-মন্দ মিলিয়েই বড় হতে থাকেন সফুরা।

বাবা সামসুদ্দিন ছিলেন রংপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং মহল্লার দেওয়ানী। ছোটকাল থেকেই সফুরা ছিলেন সাহসী, চঞ্চল ও দুরন্ত স্বভাবের। কোন বাঁধাধরা নিয়ম তার ভালো লাগতো না। বাবার সাথে মাঝে মাঝে তিনি মহল্লার বিভিন্ন সালিশে যেতেন। সালিশ থেকে নারীদের বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে সাথে সাথে বাবার কাছে এর প্রতিবাদ জানাতেন। সত্যিকারের দোষীকে শাস্তি দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করতেন বাবাকে।

৫ বছর বয়সে জুম্মাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় সফুরা শিক্ষাজীবন। দ্বিতীয় শ্রেণি পাশ করার পর ভর্তি হন রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। লেখাপড়া, খেলাধুলা ও সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি অসহায়, অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো তার এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়। যদিও এ কাজগুলোকে পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় বাড়াবাড়ি বলে মনে করতো।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় একদিন বিদ্যালয় থেকে বাসায় এসে দেখেন তার বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। তিনি বিয়েতে রাজি না থাকলেও পরিবারের ইচ্ছেমত বিয়ে করা ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না। ১৯৭১ সালে দিনাজপুর জেলার বালুবাড়ি এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার বিয়ে হয়। স্বামী মো. রেজাউল করিম চৌধুরী পেশায় একজন প্রকৌশলী।

বিয়ের পর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় কি-না এ নিয়ে সফুরা সবসময় ভীত থাকতেন। অবশেষে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে রাজি করিয়ে তিনি আবারও লেখাপড়া শুরু করেন। লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সফুরা ম্যাডাম তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। নিয়মিত ক্লাস করতে না পারলেও তিনি সফুরাকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেন। অবশেষে ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাশ করেন সফুরা। এরপর সাংসারিক নানা জটিলতার কারণে দু বছর লেখাপড়া বন্ধ রাখতে বাধ্য হন তিনি।

বিয়ের পর প্রথম তিন বছর শশুর বাড়িতে তাকে যৌথ সংসারে থাকতে হয়। এ সময় মাঝে মাঝে অন্যান্যদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হত। কিন্তু সংসারের শান্তির কথা ভেবে এসব বিষয়ে কখনো স্বামীর কাছে নালিশ করতেন না। বরং মুখ বুঝে সব সহ্য করতেন।

মূলত শিশুকাল থেকেই সফুরা রেজা চৌধুরী বেড়ে ওঠেন এক ধরনের বৈরী পরিবেশে। সৎ মায়ের সংসারে প্রতিটি কাজ শেষ করে তবেই তিনি স্কুলে যেতে পারতেন। আবার স্কুল থেকে ফিরেই সংসারের কাজ শুরু করতে হতো। তারপরও ভালোমত খাওয়া জোটেনি তার। রাতের বেলা হারিকেন জ্বালিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন তিনি। তাই শ্বশুর বাড়ির বৈষম্যকে তার নতুন কিছু মনে হয়নি। শশুরবাড়িতে তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। ইচ্ছে করলেই তিনি কোনো প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না। এক্ষেত্রে তাকে সরাসরি না বললেও তাদের আচরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতেন।

১৯৭১ সালে প্রথম সন্তানের জননী হন সফুরা। নাম রাখেন কামরুজ্জামান সেলিম রেজা। ১৯৮৪ সালে সফুরার কোলজুড়ে আসে দ্বিতীয় সন্তান ইমতিয়াজ শাওন রেজা আর ১৯৯২ সালে জন্ম নেয় সফুরার তৃতীয় সন্তান ইমরান শিশির রেজা।

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও সফুরা ১৯৭৮ সালে বেগম রোকেয়া কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে একই কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন।

বিএ পাশ করার পর সফুরা ১৯৮৩ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিলিং সুপার ভাইজার পদে যোগদান করেন। এ সময় তিনি কর্মস্থল রংপুরের মিঠাপুকুরে অবস্থান করতেন। কিন্তু চাকুরি করার কারণে তিনি সন্তানদের পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। পাঁচ বছর পর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে আবারও ঘরমুখো হন তিনি।

কিন্তু সফুরা বসে থাকার মানুষ নন। সন্তানদের রংপুর শিল্পকলা একাডেমীতে তবলায় ভর্তি করে দিয়ে তিনি নিজেও সংগীত বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৯৮ সালে সংগীত বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া হামদ, নাত ও কেরাত প্রতিযোগিতায় তিনি সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

২০০২ সালে সফুরা এপেক্স ক্লাবের সাথে যুক্ত হন। বর্তমানে এ ক্লাবে ফেলোশিপ এন্ড এটেনডেন্স ডিরেক্টর-এর পদে রয়েছেন তিনি। এ পদে থেকে দুস্থ মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া তিনি নিউ জুম্মাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি এবং রংপুর পৌরসভার টিএলসিসি-এর একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০০৮ সালে সফুরা অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ আয়োজিত ১৩২৪তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। এর আগে ২০০৬ সালে অংশগ্রহণ করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে।

প্রশিক্ষণের পর মনোবল বেড়ে যায় সফুরার। নারীনেত্রী হিসেবে তিনি সমাজ উন্নয়নের প্রতিটি কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। শিশুবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টায় ৪০টি শিশুবিবাহ বন্ধ হয়েছে এবং যৌতুকবিহীন বিবাহ হয়েছে ৫টি। আর পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ হয়েছে ১৩০টি পরিবারে। এছাড়া মহল্লার বিভিন্ন স্থানে স্যানিটেশনের ওপর উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন তিনি।

শিক্ষার উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন সফুরা। চালু করেছেন একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। এছাড়া তিনি ২শ’ শিশুকে স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং ঝরে পড়া ১শ’ ৫০ জন শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়মুখী করেছেন। ১৫ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফরম ফিলাপের টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন, যাদের অনেকেই পরীক্ষায় পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে ২০০৯ সালে সফুরা ‘জুম্মাপাড়া সঞ্চয়ী সমিতি’ গঠন করেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪০ জন। বর্তমানে এ সমিতির সঞ্চয় ৭৫ হাজার টাকা। সমিতি থেকে জনপ্রতি ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে। ঋণ নিয়ে সদস্যরা সঠিক কাজে ব্যবহার করছে কি-না সফুরা এ বিষয়টি তদারকি করেন। সমিতির সদস্যদের নিজ বাড়ির আনাচে কানাচে গাছ লাগানোর জন্যও উৎসাহিত করেন তিনি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও কাজ করছেন সফুরা। কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত নারীনেত্রীদের কনভেনশন ও উজ্জীবক পুনর্মিলনীতে তিনি শুধু দলগতভাবে অংশগ্রহণ করেন না, বরং দলগতভাবে সংগীত পরিবেশন করেন।

বাবা ও শশুরবাড়িতে বিভিন্ন বাধার কারণে অনেক কাজই তিনি করতে পারেননি। এ জন্যই সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য অবদান রাখতে চান তিনি। ‘এডুকেশন ফর ফ্রিডম’ (মুক্তির জন্যই শিক্ষা) এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান তিনি। তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে।
দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সফুরা রেজা নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একইভাবে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলছেন নিজ সন্তানদেরকেও। তার প্রচেষ্টার কারণে শুধু লেখাপড়ায় নয়, একইসাথে তার সন্তানরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ভূমিকা রেখে চলেছে। এজন্য সফুরা রেজা চৌধুরী একজন গর্বিত মা-ও বটে।

আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন শিল্পী রাণী রায়
নেসার আমিন

একটা সময় ছিল সন্তান উৎপাদন এবং রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নারীর জীবন। কিন্তু আধুনিক যুগে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলস্বরূপ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। প্রসার ঘটে নারী শিক্ষার। ক্রমান্বয়ে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এর ইতিবাচক ফলাফলও আসতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় যুগ যুগ ধরে অসংখ্য নারী তাদের পরিবারকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখে গেছেন। দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার শিল্পী রানী রায় এমনই একজন নারী। সব প্রতিকূলতা এড়িয়ে যিনি নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

শিল্পী রানী রায়। বাবা নিতাই চন্দ্র রায়, মা উষা রানী রায়। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট কাহারোল উপজেলার ঈশানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এক ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। শিল্পী বাবা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের পিয়ন। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চাকুরি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু কাপড়ের দোকান থাকায় আর্থিক অনটনে পড়তে হয় নি শিল্পীর পরিবারকে।

শিল্পীর দু বছর বয়সে তার বাবা তাদের সব জমি, বাড়ি ও দোকান বিক্রি করে মুটুনী হাট এলাকায় চলে যান। সেখানে পাঁচ বছর থাকার পর আবার নানা বাড়িতে চলে আসেন। অনেক জায়গা-জমির সুবাদে শিল্পীর নানা ধনী হওয়ায় তার বাড়ির পাশেই শিল্পীদের বাড়ি করে দেয়।

ঈশানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শিল্পীর শিক্ষাজীবন। এ সময় পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যের মাঝেও তাকে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করে নি তার পরিবার। ১৯৯৪ সালে শিল্পী দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস করেন। এরপর কাহারোল মহিলা কলেজে ভর্তি হন তিনি। মুটুনী হাট থেকে কলেজের দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। যানবাহনে চড়ে কলেজে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না শিল্পীর। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তার ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই সাত কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটেই কলেজে যেতে হত তাকে। এ সময় তিনি রংপুর মেডিক্যাল কলেজের সন্ধানী হতে মাসিক ৪৫০ টাকা করে উপবৃত্তি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি যুব উন্নয়ন থেকে মৎস্য চাষের ওপর ১৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এরপর স্থানীয় ৩০ জন নারী ও পুরুষ মিলে 'জন মজুর সমিতি' গঠন করেন। এ সময় তিনি যুব উন্নয়ন থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এ টাকা দিয়ে শিল্পীর বাবা স্থানীয় বাজারে দোকান ভাড়া নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। এরপর শিল্পী কাহারোল উপজেলা সদরে এমসিআই নামের একটি ঔষধ কোম্পানিতে মাস প্রতি ১ হাজার ২শ' টাকা বেতনে একটি চাকুরি পান। ৬ মাস পর বীরগঞ্জে পোস্টিং দেয়ায় চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি। চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি টিউশনি করা শুরু করেন।

১৯৯৬ সালে শিল্পী এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন শিল্পী। কিন্তু পরীক্ষার হলে গণ্ডগোল হওয়ায় সে বছর মহিলা কলেজের কোন ছাত্রীই পাশ করতে পারে নি। কিন্তু হতাশ না হয়ে আবারও লেখাপড়া শুরু করেন তিনি। ১৯৯৭ সালে তিনি আবারও এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কে বা কাহারা বইয়ের একটি পাতা তার পেছনে ফেলে রাখে। এ কারণে তিনি পরীক্ষায় বহিষ্কার হন। ভাগ্যকে মেনে নেন তিনি।

১৯৯৮ সালে একই গ্রামে নির্মল চন্দ্র করের সাথে শিল্পীর বিয়ে হয়। নির্মল কর তাকে পছন্দ করেই বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর তার প্রতি তেমন একটা খোঁজ খবর রাখতো না। বিয়ের এক বছর পর এক পুত্র সন্তানের জননী হন তিনি। স্বামীর বাড়তি কোন আয় না থাকায় মুটুনী হাটে এক দর্জির দোকানে কাজ নেন তিনি।

একদিন মুটুনী হাট থেকে বাড়ি ফিরতে ব্র্যাক-এর এক কর্মীর সাথে শিল্পীর সাথে দেখা হয়। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি জানান, ব্র্যাক-এ স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে কিছু নারী নেওয়া হবে, এজন্য প্রথমে ১৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণে

অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০০৩ সালে জানুয়ারি মাসে ব্র্যাকের কান্ডনগর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর স্বাস্থ্যকর্মী পদে নিয়োগের জন্য শিল্পীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৬৫০ টাকা বেতনে তিনি এ চাকুরিতে যোগদান করেন। তার দায়িত্ব ছিল এলাকায় গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সেবা করা, যৌতুক বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিশুবিবাহ বন্ধ করা, শিশুদের টীকা দানে উদ্বুদ্ধ করা, যক্ষ্মা সম্ভাব্য রোগীদের কফ পরীক্ষা করা, কিশোরীদের পুষ্টিকর খাবারে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সম্পর্কে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক করা। শিল্পী চাকুরি করেন বলে পরিবারের লোকজন তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে। তারা ভাবতেন – এনজিওতে চাকুরি করলে তাদের সম্মান নষ্ট হবে। কিন্তু সংসারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিল্পী চাকুরি করতে থাকেন।

চাকুরির পাশাপাশি ২০০৯ সালে শিল্পী মুটুনী হাটে ছোট একটি ঔষধের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। আস্তে আস্তে দোকানের পরিসর বড় হতে থাকে। মুটুনী হাটে মাত্র দু জন নারী ব্যবসায়ী। নারী ব্যবসায়ী হিসেবে শিল্পী বহু সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি সাহস হারান নি। এলজিইডি কর্তৃক মুটুনী বাজারে মহিলা বিপনী কেন্দ্রে চারটি দোকান স্থাপন করা হয়। সেখানে ২৫ জন নারী দোকান ঘরের জন্য আবেদন করে। এর মধ্যে যে চার জনকে বাছাই করা হয় তার মধ্যে একজন ছিলেন শিল্পী।

চাকুরি ও নারী ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকায় পরিচিতির কারণে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে আরও বেশি পরিমাণে যুক্ত করার তাগিদ থেকে ২০১১ সালে শিল্পী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন। কিন্তু সামান্য ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হন।

এর মধ্যে এক দিন ব্র্যাক কার্যালয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাসেবী শেফালী ও রেহানার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' ফাউন্ডেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হবে। তাদের আমন্ত্রণে ২০১১ সালের ২৬ অক্টোবর উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, নেতা জন্মায় না, কর্মের মধ্য দিয়েই নেতা গড়ে ওঠে। আরও জানতে পারেন, নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষকেও লাভবান করে এবং নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি।

প্রশিক্ষণের পর শিল্পী শিশুবিবাহ বন্ধে সচেষ্ট হন। কারণ তিনি জানেন, শিশুবিবাহ কন্যাশিশুদের জন্য একটি অভিশাপ। এর ফলে কন্যাশিশু অল্প বয়সে মা হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাড়িভাষা গ্রামে কবিতা নামের একটি মেয়ের শিশুবিবাহ বন্ধ করতে গিয়ে শিল্পীকে অনেক কষ্ট করতে হয়। মেয়ের বাবা বলেন, এখন যদি আমরা মেয়েকে বিয়ে না দেই, পরে যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হবে। উত্তরে শিল্পী বলেন, বিয়ের পর অল্প বয়সে মা হতে গিয়ে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তখন তার মৃত্যুর দায় কে নেবে? এরপর মেয়ের বাবা কবিতার বিয়ে বন্ধ করে দেন। কবিতা বর্তমানে দশম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে।

ব্র্যাক-এ স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে কাজ করার সুবাদে প্রায় ২০ জন যক্ষ্মা রোগীকে সুস্থ হতে সহায়তা করেছেন শিল্পী। গর্ভবতী মায়েরা যাতে সুস্থ শিশুর জন্ম দেয়, এজন্য তাদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে তিনি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। এ পর্যন্ত শিল্পীর হাতে সুষ্ঠুভাবে ২০ জন গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব প্রসূতি মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

স্থানীয় নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে ২৮ জুলাই তিনি ঈশানপুর মুটুনী বাজারে ২৫ জন কিশোরী ও নারীকে নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন সমিতি গঠন করেন। সমিতিতে সদস্যরা প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে সঞ্চয় করে। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩ হাজার টাকা।

শিল্পী জানান, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আমাকে দেখিয়েছে ভবিষত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। আমাকে শিখিয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। আর এ শিক্ষা থেকেই শিল্পী রানী রায় সদা নিয়োজিত আছেন নারী উন্নয়ন তথা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে।

তথ্য সংগ্রহে: তুহিন আলম।

জীবনযুদ্ধে জয়ী শ্রীমঙ্গলের নারীনেত্রী সুইটি

এ.এস.এম.আখতারুল ইসলাম

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাকে বলা হয় চায়ের রাজধানী। পাহাড়ঘেরা এই জনপদের কালাপুর ইউনিয়নের কালাপুর নামক ছোট্ট গ্রামে নারীনেত্রী সুইটির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পুরো নাম হোসনে আরা সুইটি। তার জন্ম ১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর। বাবা মোঃ আলফু মিয়া ও মা রোকেয়া বেগমের নয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান হলেন এই কৃতি সংগ্রামী নারী।

ছয় বছর বয়সে তার বাবা তাকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন স্থানীয় কালাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছোট্টবেলা থেকেই সুইটি ছিলেন তার সমবয়সীদের চেয়ে মেধাবী ও দুরন্ত। পাশাপাশি অন্যের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ছিল তার মহৎ অভ্যাস। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সুইটির নানা প্রতিভা ও গুণের কথা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মানুষের মুখে মুখে।

১৯৯৮ সাথে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি ভর্তি হন স্থানীয় স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভৈরব গঞ্জ দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর থেকেই বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে স্থানীয় কিছু বখাটে ছেলে তার পিছু নেয়। মেয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দেখে যেখানে বাবা খুশি হবেন, সেখানে তিনি পড়লেন বিড়ম্বনার মধ্যে। তিনি বিষয়টি বখাটে ছেলেদের অভিভাবকদের জানালেও কোন সুফল পেলেন না। বরং ছেলেগুলোর অভিভাবকরা বললেন, এই বয়সের ছেলেরা অমন একটু বদমায়েসী করেই থাকে। পাশাপাশি তারা মেয়েকে বিদ্যালয়ে পড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এভাবে অভিভাবকদের আশকারা পেয়ে বখাটে ছেলেগুলো যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। শেষমেষ মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুইটির বাবা তার বিয়ে ঠিক করেন স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার আবুল কালাম আজাদের সাথে। ১৫ বছরের সুইটি তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। বাবার ইচ্ছানুযায়ী পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিশুবিবাহের শিকার হন সুইটি।

বিয়ের পর সুইটির লেখাপড়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুরু হয় সংসার জীবন। বিয়ের বছর দুয়েক পর তার কোলজুড়ে আসে প্রথম সন্তান ফাহিম হাসান। এর পাঁচ বছর পরে জন্ম হয় ছোট ছেলে শাহরিয়া নাসিমের। বড় ছেলে বর্তমানে ভৈরবগঞ্জ দ্বি-পাক্ষিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে গোল্ডেন জিপিএসহ বৃত্তি পেয়েছে। আর ছোট ছেলে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। সেও বড় ভাইয়ের মত মেধাবী। তার রোল নম্বর এক। সন্তানদের এই সাফলের পেছনে রয়েছে মা সুইটির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দূরদর্শীতা।

গ্রামের আর দশটা মেয়ের মত সুইটি গতানুগতিক চিন্তা করত না। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ তার ভাবনার জগতকে আরও প্রসারিত করে। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ৩৫তম ব্যাচের সদস্য। সময়টা ছিল ২০০৯ সাল। এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি প্রশিক্ষণ পরবর্তী মাসিক ফলোআপ সভাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হত এবং পরবর্তী মাসের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। ফলোআপ সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় অবহেলিত নারীদের নিয়ে নানাবিধ ইস্যুভিত্তিক উঠান বৈঠকে অংশ নিতেন তিনি। এতে সামাজিক কাজের পাশাপাশি তার দক্ষতাও বাড়তে থাকে। এ সময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু যেমন, শিশুবিবাহ, যৌতুক, স্যানিটেশন, নারী নির্যাতনসহ নানাবিধ বিষয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে শিশুবিবাহ বিষয়ে এলাকায় ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি হওয়ায় বর্তমানে কালাপুর গ্রামটি অনেকটাই শিশুবিবাহমুক্ত।

এসব কাজের জন্য সুইটি ২০১০ সালে ব্র্যাকের মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ফলে তার কাজের পরিধি আরও বাড়তে থাকে। তিনি নিজের এলাকা ছাড়াও লামুয়া, গাজীপুর, ছাওতলী বাগানসহ জাগছড়া বাগানে কাজ শুরু করেন। এতে পরিচিতির পাশাপাশি এলাকায় তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এলাকাবাসী ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য আহক্ষান জানায়। তাদের সমর্থন ও ভালবাসা নিয়ে ২০১১ সালে কালাপুর ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তিনি।

ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়ে সুইটি এলাকার উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণে মনোনিবেশ করেন। চাকুরি ছেড়ে সমাজ সেবাকেই নিজের দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। সুইটির হাত ধরে তার দুই বোন পান্না ও ফারহানা এবং ভাই জুবেদ দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। এভাবে সুইটি শুধু নিজে নয় বরং আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন হাজারো হৃদয়ে। আর কবির ভাষায় বলতে হয়, এমন জীবন করিতে হবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন.....। সুইটি যেন সে জীবন গঠনের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্বনির্ভর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন মর্জিনা

মোঃ আব্দুল হালিম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম উচালিয়া পাড়া। ১৯৬৮ সালে এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন নারীনেত্রী মোছাঃ মর্জিনা বেগম। বাবা আব্দুল মোতালেব আর মা হালিমা খাতুন। পরিবারে সাত ভাই বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান হিসেবে মর্জিনা বেগম ছিলেন সকলের আদরের। তার বাবা ছিলেন আদমজী জুট মিলের কর্মচারী আর মা গৃহিণী। পিতাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে বেড়ে ওঠা ছিল মর্জিনার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯৭৭ সালে শুরু হয় মর্জিনার শিক্ষাজীবন। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন উচালিয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হন সরাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ায় যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন মর্জিনা। পাশাপাশি খেলাধুলায়ও ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর তার আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৭ সালে পরিবারের সিদ্ধান্তে আপন চাচাত ভাই মোঃ আব্দুল হেকিম মিয়ার সাথে মর্জিনার বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্বামীর বেকারত্বের কারণে তিনি বাবার সংসারেই অবস্থান করেন। ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে মর্জিনা বেগম প্রথম কন্যা সন্তানের জননী হন। কন্যা সন্তান জন্মদান মর্জিনার জীবনে নিয়ে আসে অভিশাপ, শুরু হয় তার জীবনে দুর্দশা। প্রতিনিয়ত তিনি শ্বাশুড়ির দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। স্বামীর আয় না থাকার কারণে বেশির ভাগ সময় তিন বেলা সামান্যতম ডাল-ভাত পর্যন্ত জুটতো না মর্জিনার। খেয়ে না খেয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৯১ সালে তার কোলজুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। এরপর আরও তিন মেয়ে সন্তানের জননী হন তিনি।

সংসারের হাল ধরতে মর্জিনা বেগম সুঁই সুতা দিয়ে হাতে সেলাইয়ের কাজ করতেন। একটি সেলাই মেশিন কেনার সামর্থ পর্যন্ত ছিল না তার। সেলাই কাজের মাধ্যমে তিনি প্রতিমাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করতেন। পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহযোগী হিসেবে মাসিক ৬০০ টাকা বেতনে কাজ করতেন। মেয়ের পরিবারে অভাব অনটন দেখে মর্জিনার বাবা কাপড়ের ব্যবসা করার জন্য মর্জিনার স্বামীকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু ব্যবসায় ব্যর্থ হন তার স্বামী। সংসারের হাল ধরতে ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন মর্জিনার স্বামী। এক মাস না যেতেই ইটভাটায় এক দুর্ঘটনায় মর্জিনার স্বামী গুরুতর আহত হন। স্বামীর চিকিৎসা আর সংসারের খরচ যোগাতে মর্জিনাকে হিমশিম খেতে হয়। দীর্ঘ ১১ বছর অসুস্থ থাকার পর ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে তার স্বামী মারা যান।

২০০৫ সাল। এ সময় স্থানীয় উজ্জীবক শরীফ উদ্দীন তাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৬-৯ আগস্ট সরাইল ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত ৭৬৩তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে মর্জিনা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মর্জিনা বেগম যেন নিজের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি ফিরে পান। 'আমিও মানুষ, আমিও আর দশজন মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারি'- এই প্রত্যয় সামনে রেখে নতুন করে মর্জিনার পথ চলা শুরু হয়।

নিজের পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও মর্জিনা বেগম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে মর্জিনা বেগম কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি স্থানীয় অসহায় নারীদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। নারীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে গড়ে তোলেন নারী সংগঠন, যার মাধ্যমে ৪০ জন নারী সংগঠিত হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমে সঞ্চয়ের পাশাপাশি নিজের পরিবার ও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। মর্জিনা বেগমের কর্মকাণ্ড সমাজের অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু। তথাকথিত সমাজপতিরা মর্জিনা বেগমের এই সকল কর্মকাণ্ডকে বেহায়াপনা বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু তার অদম্য চেষ্টা, আত্মবিশ্বাস এই সমস্ত বাধা পেরিয়ে পথ চলতে সাহায্য করে। তার নেতৃত্বেই এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়।

মর্জিনার সক্রিয় ভূমিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ হয়েছে দেড় শতাধিক, শিশুবিবাহ প্রতিরোধ হয়েছে ১০টি, নিরাপদ সন্তান প্রসব হয়েছে ১২০ জনের, নিরক্ষরমুক্ত হয়েছেন ৬০ জন নারী। ১৩২ জনের জন্মনিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছেন মর্জিনা। ২৫০টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিন শতাধিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এছাড়া মর্জিনার সহযোগিতায় ৯৫টি নলকূপ বসানো সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ছয় শতাধিক মানুষ নিরাপদ পানি পান করছে। তিনি ৯০ জন ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

মর্জিনা ২০১২ সালে ৮৯তম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সরাইল উপজেলার মনোয়ার হাসপাতালে সহযোগী সেবিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। তার মাসিক বেতন চার হাজার টাকা। তার একমাত্র ছেলে রাজমিস্ত্রী ও ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করে প্রতি মাসে আট হাজার টাকা আয় করে।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বাসনায় ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর ৭নং সরাইল ইউনিয়ন পরিষদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড) উপনির্বাচনে প্রার্থী হন মর্জিনা। মানুষের ভালবাসায় তিনি বিপুল ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। মর্জিনা বলেন, 'নির্বাচনে বিজয়ী করার মাধ্যমে আমার কাজ করার ক্ষেত্র বেড়ে গেছে। মানুষের পাশে দাড়ানোর অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করাই হবে আমার দৃঢ় প্রত্যয়।'

মর্জিনা বেগমের ভবিষ্যৎ ভাবনা – ছোট মেয়েকে লেখাপড়া করার মাধ্যমে ডাক্তার বানানো এবং সুযোগ্য পাত্র দেখে প্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে না পারলেও সর্বদা মানুষের বিপদে আপদে সহযোগিতা করা, সামাজিক কাজের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিজেকে যুক্ত রাখা এবং অন্যদের যুক্ত করা তথা সর্বোপরি স্বনির্ভর সমাজ গড়ে তোলা।

সমাপ্ত